ওঁ

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীশ্রীশঙ্কর পুরুষোত্তম তীর্থ স্বামীজী মহারাজের

যোগবাণী

বা

সিদ্ধযোগোপদেশ

"আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রং পরং মতম্।
যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি নিশ্চিতম্।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতম্॥"

শিব-সংহিতা

১৩৩৪ সন

প্রকাশক—

শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত, এম্, এ, বি, এল্।

মূল্য এক টাকা

পুরী, গোবর্দ্ধন মঠাধীন পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রী১০৮ শঙ্কর পুরুষোত্তম তীর্থ-স্বামী।

প্রকাশকের নিবেদন।

প্লাবনের সময় যখন সমস্ত জলময় ও একাকার হইয়া যায়, সেই সময় সেই প্লাবিত বিশালসমুদ্রবৎ প্রতীয়মান জলের উপর দিয়া নৌকা-চালন করা অতীব দুরূহ। ক্ষুদ্র ভেলা বা ডিঙ্গি তাহার উপর দিয়া অনায়াসে লইয়া যাওয়া যায় বটে, কিন্তু বৃহৎ নৌকা বাহিতে গেলে অগভীর স্থলে যাইতে নৌকা বানচাল হইবার সম্ভাবনা। আমাদের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ। এই ভাবপ্লাবনের যুগে অনেকেই ব্যাকুল ও সাধনোন্মুখ। উপদেষ্টৃকুল অকূলসমুদ্রবৎ প্রতীয়মান প্লাবিত দেশের ন্যায় পড়িয়া আছেন। আমরা তরী ভাসাইয়াছি। যাঁহাদের শুধু দুটা নীতি কথা জানার প্রয়োজন তাঁহাদের কোন বিঘ্ন নাই, ভেলার ন্যায় তাঁহারা অগভীর জলের উপর ভাসিয়া চলিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা গভীর তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে চান, সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া পূর্ণসিদ্ধিলাভ দ্বারা নিজের ও জগতের মঙ্গল চান, সেই সকল গভীরতল পোত অগভীর জলের উপর চালাইতে গেলে বানচাল হইবার সম্ভাবনা। তাই এই যুগে বৈদ্যসঙ্কটের মত এত গুরুসঙ্কটের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। জীব অনন্তকাল ধরিয়া এই জগৎরূপ সাধনক্ষেত্রে সাধন করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়া আসিতেছে সুতরাং এই সাধন-কাহিনী অতি পুরাতন এবং সাধন-পদ্ধতিও সুপরীক্ষিত। যাঁহারা কিছু নূতন দেখিয়া আকৃষ্ট হন ও কিছু অসম্ভব লাভ করিবার আশায় প্রলুব্ধ হন তাঁহারাই প্রতারিত হন। সাধনার মূলমন্ত্র একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা হারাইলে একাগ্র ও একনিষ্ঠ হইয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। গুরুকে আত্ম-নিবেদন করিতে হয় অর্থাৎ অকপটে তাঁহাকে

সমস্ত সন্দেহের কথা জানাইতে হয়; তাহা হইলেই তিনি সন্দেহভঞ্জন করিতে পারেন। আবার, গুরুকৃপায় নব নব উপলব্ধি লাভ হইলে এই আগ্রহে ভাঁটা পড়িতে পায় না। ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরবর্ত্তী ভ্রমণকারিগণ অনেক তথ্য সংগ্রহপূর্ব্বক উৎসাহিত ও আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হন এবং সহযাত্রিগণও পরস্পরের অভিজ্ঞতার তুলনায় অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন, এই মনে করিয়াই 'যোগবাণী বা সিদ্ধযোগোপদেশ' প্রকাশিত হইল।

শ্রীমৎ গুরুদেবের নিকট যখন কোন্ শিষ্য বা ভক্ত কোন প্রশ্ন করিতেন, সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর তিনি পরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; তাহা হইতেই এই পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। সাধুসন্ন্যাসীরা এরূপ পুস্তক প্রচারের বড় বিরোধী। তাঁহারা বলেন অসময়ে অনধিকারীকে উপদেশ দেওয়া বিষদান তুল্য অনিষ্টকর। সেইজন্য এতদিন তাঁহার অনুমতির অভাবে পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। অবশেষে একই প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য কর্ত্তৃক বার বার উপস্থাপিত হওয়ায় শিষ্যদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তাঁহার কৃপায় সেই বাধা অতিক্রম করিতে পারা গিয়াছে।

যাঁহার প্রেরণা এই চেষ্টার মূল, তাঁহার করুণাই ইহাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবে, ইহাই আমাদের আশা। অলমতি বিস্তরেণ।

বিষয়-সূচী।

ওঁ

যোগবাণী

বা

সিদ্ধযোগোপদেশ

প্রথম বিবৃতি

শিষ্য। গুরুদেব! এই সংসারে সকলেই অনিত্য সুখবাসনারূপ মায়াজালে বদ্ধ হইয়া অপার দুঃখরাশি ভোগ করিতেছে এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ আবর্ত্তে ঘুরিতেছে। যাহাতে এই দুঃখরাশি ও জন্মমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, এমন একটী সহজসাধ্য উপায় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ করুন। আমি শিষ্যভাবে আপনার শরণাগত হইলাম।

গুরু। হে বৎস! তোমার প্রশ্নটী শুনিয়া বড় প্রীতি লাভ করিলাম। একদিন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দেবের দেব মহাদেবকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"সর্ব্বে জীবাঃ সুখৈর্দুঃখৈর্মায়াজালেন বেষ্টিতাঃ।
তেষাং মুক্তিঃ কথং দেব কৃপয়া বদ শঙ্কর॥

সর্ব্বসিদ্ধিকরং মার্গং মায়াজাল-নিকৃন্তনম্।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-নাশনং সুখদং বদ॥”

[যোগশিখোপনিষৎ]

অর্থ। হে শঙ্কর, সকল জীব সুখদুঃখরূপ মায়াজালে বেষ্টিত। হে দেব! কিরূপে তাহাদের মুক্তি হইতে পারে, তাহা কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। যাহা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করে, মায়াজাল কর্ত্তন করিয়া দেয় এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নাশ করে এমন একটী সুখকর উপায় বলুন।

তদুত্তরে মহাদেব, বিষ্ণুনাভিপদ্ম হইতে সম্ভূত ব্রহ্মাকে, বলিয়াছিলেন—

“নানামার্গৈস্তু দুষ্প্রাপং কৈবল্যং পরমং পদম্।
সিদ্ধিমার্গেণ লভতে নান্যথা পদ্মসম্ভব॥”

অর্থ। হে পদ্মসম্ভব! কৈবল্যরূপ পরম পদ লাভের নানা উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল উপায়দ্বারা তাহা লাভ করা সহজসাধ্য নহে; একমাত্র সিদ্ধিমার্গদ্বারাই কৈবল্যপদ সহজে লাভ করা যায়, অন্য প্রকারে নহে।

বৎস! কৈবল্যলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। কৈবল্যমুক্তি হইলেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়। দুঃখনাশ হইয়া গেলে পুনরায় তাহার উদয় না হওয়াই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। কৈবল্য বা মোক্ষলাভ হইলে জীবের আর জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। ইহা লাভের সহজ পন্থাই সিদ্ধিমার্গ বা **সিদ্ধযোগ**।

শিষ্য। গুরুদেব! সিদ্ধিমার্গ কাহাকে বলে এবং কৈবল্য কি তাহা, দয়া করিয়া আমাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! যে পথে বিনা ক্লেশে যোগলাভ হয়, সেই পথকে

'সিদ্ধিমার্গ' কহে। যোগরূপ সিদ্ধিলাভের পথই সুষুম্না নাড়ী; এই নাড়ীতে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ হইলে সাধকের জীব-ব্রহ্মৈক্য-জ্ঞানরূপ যোগ লাভ হয়। প্রথমতঃ গুরুকর্তৃক শক্তি সঞ্চারিত হইলেই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন এবং তৎপরে ক্রমোন্নতি দ্বারা যোগলাভ হইয়া থাকে। যেমন তোমাকে হাঁড়ি, চাউল, কাঠ, জল ও অগ্নি ইত্যাদি কিছুই পরিশ্রম করিয়া সংগ্রহ করিতে হইল না, কেবল দাতার কৃপাতেই তদ্‌গৃহস্থিত পক্কান্নদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি করা হইল; তদ্রূপ তোমাকে পরিশ্রম করিয়া, সর্ব্বযোগের আধারস্বরূপা মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করার জন্য যোগশাস্ত্রোক্ত আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি কিছুই অস্বাভাবিক ভাবে অনুষ্ঠান করিতে হইল না, কেবল গুরুশক্তির প্রভাবে কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণদ্বারা স্বাভাবিক ভাবে যোগপথ লাভ হইল। ইহাই গীতোক্ত 'সহজ কর্ম্ম'। স্বভাব হইতে যাহা হয় তাহাই প্রকৃত সহজ। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ভেদে যোগপথ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অস্বাভাবিক উপায় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং বিঘ্নসঙ্কুল। স্বাভাবিকের বিপরীতই অস্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ হয়, তাহাই অনায়াসসাধ্য ও আরামপ্রদ, এবং তাহাতে কোন বিপদেরও সম্ভাবনা নাই। দেখ, বৎস! যখন স্বভাবতঃ আমাদের নিদ্রা, ক্ষুধা, মল ও মূত্রাদির বেগ হয় তখন নিদ্রা গেলে, আহার করিলে এবং মল ও মূত্রাদি ত্যাগ করিলে শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক আনন্দ অনুভব হয়। কিন্তু নিদ্রা অনুভব করিতেছি না তথাপি জোর করিয়া নিদ্রা গেলাম, তাহাতে সুষুপ্তির পরিবর্ত্তে স্বপ্নই উপস্থিত হইতে থাকে এবং তাহাতে শারীরিক ও মানসিক অস্বচ্ছন্দতা অনুভূত হয়। ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই অথচ ভোজন করিলে, তাহাতে অজীর্ণতাদি দোষদ্বারা শরীর পীড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; অক্ষুধায় আহার

করিলে তাহা তেমন রুচিপ্রদও হয় না। মলের বেগ হয় নাই অথচ কুন্থনদ্বারা মলত্যাগ করিলাম, ইহাতে ভবিষ্যতে গুহ্যরোগাদির উৎপত্তির সম্ভাবনা আছে ; কিন্তু বেগ হইলে পর মলত্যাগ করিলে শারীরিক ও মানসিক আরামবোধ হয়। তদ্রূপ অন্তর হইতে স্বাভাবিকভাবে আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি করিবার ইচ্ছা হইলে এবং তদনুসারে ক্রিয়া করিলে, তাহা সহজ ও শান্তিপ্রদ হয়। স্বভাব হইতে যাহা হইতে চাহে, তাহাতে বাধা প্রদান করিলে বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। যেমন শোকে যখন কান্না পায় তখন তাহা বাধা প্রাপ্ত হইলে বুকে ভয়ানক আঘাত লাগে, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিলেই শরীর ও মন হাল্কা বোধ হয় ; মল ও মূত্রাদির বেগ হইয়াছে, তখন তাহা ত্যাগ না করিয়া বেগরোধ করিলে ক্লেশ জন্মে ও রোগোৎপত্তির সম্ভাবনা হয়, কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলেই আরাম ; তদ্রূপ গুরুশক্তিপ্রভাবে স্বভাবতঃ যে সকল আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি এবং নানারূপ অঙ্গসঞ্চালনাদি হইতে চাহে, তাহাতে বাধা প্রদান করিলে মানসিক অশান্তি বোধ হইবে এবং শরীরেও ভাল লাগিবে না। দেখ, বৎস ! বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনের স্বভাবের বৈষম্য হইলে যেমন বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইতে হয় এবং বৈদ্য-ব্যবস্থাপিত ঔষধপথ্য ব্যবহারদ্বারা স্বভাবের সহায়তা করিতে থাকিলে শরীর স্বভাবতঃই নীরোগত্ব লাভ করিতে থাকে ; তদ্রূপ সদ্‌গুরুকৃপায় শক্তিসঞ্চারদ্বারা সিদ্ধিমার্গ লাভ হইলে, একমাত্র গুরূপদিষ্ট মন্ত্রজপ বা ধ্যানদ্বারাই স্বভাবতঃ আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান ইত্যাদি যোগাঙ্গ সকল অনায়াসে সাধিত হইতে থাকিবে ; এইজন্য তোমাকে বিশেষ আয়াসস্বীকার বা চেষ্টা করিতে হইবে না, কিম্বা গুরুর নিকট এই সকল আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামাদির স্বতন্ত্রভাবে উপদেশ লইবারও প্রয়োজন হইবে না।

এই পথে ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে তুমি অচিরে যোগসিদ্ধি লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইবে। এই যে উপায়দ্বারা স্বভাবতঃ যোগাঙ্গাদি সাধনক্রমে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান বা অখণ্ডচৈতন্যানুভূতি হয় তাহাই সিদ্ধিমার্গ বা **সিদ্ধযোগ**।

এখন কৈবল্য কি, তাহা বিশদভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ। তন্মধ্যে সত্ত্ব জ্ঞানাত্মক, রজঃ ক্রিয়াত্মক এবং তমঃ আলস্য-জড়াত্মক সুতরাং ক্রিয়াবরোধক। যখন চিত্তসত্ত্ব (বুদ্ধি) রজঃ ও তমঃ এই উভয়ের সহিত মিশ্রিত থাকে, তখন চিত্ত ঐশ্বর্য্য ও বিষয়প্রিয় হয়। যখন চিত্তসত্ত্ব তমোগুণদ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, তখন চিত্ত অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্যপ্রিয় হয়। যখন চিত্তসত্ত্ব রজোগুণমাত্রদ্বারা অনুবিদ্ধ হয়, তখন চিত্তের মোহ আবরণ ক্ষীণ ও সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানের প্রকাশ হইতে থাকে, এবং চিত্ত ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যপ্রিয় হয়। যখন চিত্তে অল্পমাত্রও মলাস্বরূপ রজোগুণ না থাকে, তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয় এবং সত্ত্ব (বুদ্ধি) হইতে পুরুষ অর্থাৎ চেতন আত্মা পৃথক্ এইমাত্র জ্ঞানে অবস্থিত থাকে; তৎকালে চিত্ত 'ধর্ম্মমেঘ' নামক ধ্যানপরায়ণতা লাভ করে। যোগিগণ ইহাকে অতিশ্রেষ্ঠ 'প্রসংখ্যান' নামে আখ্যা দেন। প্রসংখ্যানই বিবেকজ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি। যোগদ্বারা চিত্ত হইতে রজোগুণ ও তমোগুণ দূরীভূত হইলে এই বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হয়,— তখন, পুরুষ (চেতন আত্মা) চিত্ত হইতে পৃথক্, এইমাত্র জ্ঞান থাকে; ইহাই সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি*। কিন্তু যখন চিত্ত এই বিবেক-

* যোগীরা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং বেদান্তবাদীরা সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধি বলেন। সম্প্রজ্ঞাত ও সবিকল্প সমাধি এবং অসম্প্রজ্ঞাত ও নির্ব্বিকল্প সমাধি একই, কোন পার্থক্য নাই।

খ্যাতিতেও বিরক্ত হইয়া বিবেকজ্ঞানকেও নিরোধ করিতে সমর্থ হয় তখনই নির্ব্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। এই সমাধিতে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী এক অখণ্ডচৈতন্যরূপী অদ্বৈত পরমাত্মায় লীন হওয়ায়, তখন কিছুমাত্র জ্ঞানের স্ফুরণ থাকে না; কেবল চিতি-শক্তি স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে, বুদ্ধির বৃত্তি নিরুদ্ধ হওয়ায়, দ্রষ্টা আত্মা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন বটে, কিন্তু এই সমাধিভঙ্গের পর পুনরায় বুদ্ধিদ্বারা বিষয়দর্শী হন। অতঃপর দ্রষ্টা আত্মা যখন সকল অবস্থায়, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবস্থানের ন্যায়, স্বরূপে অবস্থান করেন,—যখন বুদ্ধি আর, কোন সময়েই, পুরুষের অর্থাৎ দ্রষ্টা চেতনাত্মার দৃশ্যরূপে অবস্থান করে না, তখন সেই অবস্থাকে 'কেবল' বলা যায়। সুতরাং এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিই 'কৈবল্য'লাভের প্রাথমিক অবস্থা, অর্থাৎ ইহাদ্বারাই পরে ক্রমশঃ 'কেবল' ভাব আয়ত্ত হইতে থাকে। এই কৈবল্যাবস্থা লাভ হইলেই, তখন সেই পুরুষসম্বন্ধে সত্ত্বরজস্তমো-গুণাত্মিকা প্রকৃতির কার্য্য নিরস্ত হয়, পুরুষ তখন প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ গুণাতীত হন।

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা
বা চিতিশক্তিরিতি।"

[পাতঞ্জল-যোগসূত্রম্]

অর্থ। যখন কার্য্যকারণাত্মক ত্রিবিধগুণ ভোগ ও অপবর্গ সাধন করিয়া পুরুষার্থশূন্য হয়, এবং তাহাদের কার্য্যোন্মুখতা দূরীভূত হয়, তখন সেই অবস্থাকে 'কৈবল্য' বলে, এক কথায় 'কৈবল্য' শব্দে চিতিশক্তির (চৈতন্যের) স্বরূপে অবস্থিতি বুঝায়।

শিষ্য। ভগবন্! শাস্ত্রে আছে, জ্ঞানই মুক্তির কারণ; এখন আপনার কথায় বুঝিতে পারিতেছি যে, যোগই মুক্তির কারণ। ইহাতে

আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইতেছে। এখন জিজ্ঞাসা করি, যোগই মুক্তির কারণ, কি জ্ঞানই মুক্তির কারণ? না যোগ ও জ্ঞান উভয়ই মুক্তির কারণ? কৃপাপূর্ব্বক আমাকে ইহা বুঝাইয়া মনের সংশয় দূর করিয়া দিন।

গুরু। বৎস! যেমন পক্ষিগণ এক পক্ষের সাহায্যে আকাশে উড়িতে সক্ষম হয় না, উভয় পক্ষের সাহায্যে উড়িতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ সাধক একমাত্র জ্ঞান বা একমাত্র যোগসাহায্যে মোক্ষস্বরূপ চিদাকাশে বিচরণ করিতে সক্ষম হয় না, অর্থাৎ জ্ঞান এবং যোগ উভয়ের সাহায্যে সাধক মুক্তিলাভ করে। যোগশিখা উপনিষদে আছে,—

জ্ঞানং কেচিদ্‌বদন্ত্যত্র কেবলং তন্ন সিদ্ধয়ে।
যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদং ভবতীহ ভোঃ॥
যোগোঽপি জ্ঞানহীনস্তু ন ক্ষমো মোক্ষকর্ম্মণি।
তস্মাজ্‌জ্ঞানঞ্চ যোগঞ্চ মুমুক্ষুর্দৃঢ়মভ্যসেৎ॥

অর্থ। কেহ কেহ জ্ঞানকেই মোক্ষের (আবরণধ্বংসের) উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সিদ্ধিদান করিতে পারে না। হে ব্রহ্মন্! যোগভিন্ন জ্ঞান কিরূপে মুক্তি দিতে পারে? যোগ ও জ্ঞানভিন্ন মোক্ষসাধনে সক্ষম নহে। অতএব মুক্তিলাভেচ্ছু দৃঢ়তার সহিত যোগ ও জ্ঞান উভয়েরই অভ্যাস করিবে।

বৎস! যোগদ্বারা চিত্তের চঞ্চলতা নাশ এবং জ্ঞানদ্বারা (জীবব্রহ্মের একত্ব বোধদ্বারা) সংশয় ছিন্ন হইলে মুক্তিলাভ হয়। সংশয় দুই প্রকার, যথা—প্রমাণগত সংশয় এবং প্রমেয়গত সংশয়। বেদান্তবাক্য জীব-ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছে কি অভেদ প্রতিপাদন করিয়াছে, এরূপ যে সংশয়, তাহাকে প্রমাণগত সংশয় কহে। আর জীবব্রহ্মের

ভেদই সত্য কি অভেদই সত্য এইরূপ যে সংশয়, তাহাকে প্রমেয়গত সংশয় কহে।

বৎস! পরোক্ষ এবং অপরোক্ষভেদে জ্ঞানও দুই প্রকার। গুরু-বাক্য ও শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান, এবং অনুভবাত্মক জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান কহে। এই অপরোক্ষজ্ঞান সাধনসাপেক্ষ।

"যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্ মারুতো মধ্যমার্গে
যাবদ্বিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ।
যাবদ্ধ্যানে সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
তাবজ্জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যাপ্রলাপঃ॥"

[হঠযোগপ্রদীপিকা]

অর্থ। যাবৎ প্রাণবায়ু সুষুম্নাপথে বিচরণ করিতে করিতে সহস্রারস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ না করে, যাবৎ কুম্ভকবশে বিন্দু স্থিরীভাব ধারণ না করে, যাবৎ চিত্তের ধ্যেয়াকারবৃত্তিপ্রবাহদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান না জন্মে, তাবৎ আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করা প্রলাপমাত্র।

অখণ্ডবস্তুই প্রকৃত 'তত্ত্ব'। এই অখণ্ডবস্তু (অর্থাৎ অখণ্ডচৈতন্য) বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান কহে। এই 'তত্ত্ব'কেই ভক্তেরা 'ভগবান্', জ্ঞানীরা 'ব্রহ্ম' এবং যোগীরা 'পরমাত্মা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

[শ্রীমদ্ভাগবতম্]

অর্থ। তত্ত্ববিদ্গণ অখণ্ডজ্ঞানকে 'তত্ত্ব' বলেন। এই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান কি আরও বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! যেমন দীপ জ্বালিলে অন্ধকার নষ্ট হয় জানা আছে, কিন্তু 'দীপ দীপ' করিলে অন্ধকার নষ্ট হয় না,—দীপ জ্বালিতে হয়; তদ্রূপ আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন জানা থাকিলেই আত্মা বা ব্রহ্মদর্শন হয় না, সাধনদ্বারা আত্মা বা ব্রহ্মকে দর্শন অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে হয়। সচ্চিদানন্দরূপী আত্মা বা ব্রহ্ম আছেন, ইহা জানাই পরোক্ষজ্ঞান, এবং আমিই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্ম, এইরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধিকে অপরোক্ষজ্ঞান কহে।

"অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ অপরোক্ষং তদুচ্যতে॥"
[পঞ্চদশী]

অর্থ। ব্রহ্ম আছেন, এইরূপ জানাকে পরোক্ষজ্ঞান, এবং 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভবকে অপরোক্ষজ্ঞান কহে।

বৎস! গুরূপদিষ্ট সাধনাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধিভিন্ন, কেবল শাস্ত্রশ্রবণ ও অধ্যয়নাদিদ্বারা, স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ আত্মার অপরোক্ষানুভূতি হয় না।

"স্বাত্মপ্রকাশরূপং তৎ কিং শাস্ত্রেণ প্রকাশ্যতে।"
[যোগশিখোপনিষৎ]

অর্থ। স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ আত্মাকে কি শাস্ত্র প্রকাশ করিতে পারে? অর্থাৎ শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানদ্বারা স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না।

হে পুত্র! পরমার্থদৃষ্টিসম্পন্ন মনুষ্য হইতেই শাস্ত্রের প্রকাশ, শাস্ত্র হইতে মানুষের প্রকাশ হয় নাই। কাজেই প্রথমতঃ পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা আত্মাকে সামান্যভাবে জানিয়া, পরে গুরূপদিষ্ট সাধনদ্বারা আত্মাকে

অপরোক্ষভাবে সাক্ষাৎকার করিতে হইবে; যেমন ভূগোল পড়িয়া ও মানচিত্র দেখিয়া সামান্যভাবে দেশকে জানি, কিন্তু ভূগোলে লিখিত স্থানাদিতে যাইয়া দর্শন করিলে দেশকে বিশেষভাবে জানা হয়। যোগদ্বারাই এই অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হয়। এইহেতুই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মুমুক্ষু, জ্ঞান ও যোগ উভয়ই দৃঢ়তার সহিত অভ্যাস করিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! যোগভিন্ন কেবল জ্ঞান বিচারদ্বারাই মনকে পরমাত্মসমাধিস্থ করা যায় না কি?

গুরু। বৎস! অশুদ্ধচিত্তে (অর্থাৎ চঞ্চলচিত্তে) জ্ঞানবিচার করিলে শান্তিলাভ হয় না। যদিও বা সাধক জ্ঞানবিচারদ্বারা ধ্যানস্থ হন, তথাপি সামান্য কারণেই তাঁহার চিত্তবিক্ষেপ ঘটে এবং দুঃখপ্রাপ্তি হয়। এবিষয়ে যোগশিখোপনিষদে শিব বলিতেছেন,—

সর্ব্বো যোগাগ্নিনা দেহো হ্যজড়ঃ শোকবর্জ্জিতঃ।
জড়স্তু পার্থিবো জ্ঞেয়ো হ্যপক্বো দুঃখদো ভবেৎ॥
ধ্যানস্থোঽসৌ তথাপ্যেবমিন্দ্রিয়ৈর্বিবশো ভবেৎ।
তানি গাঢ়ং নিয়ম্যাপি তথাপ্যন্যৈঃ প্রবাধ্যতে॥
শীতোষ্ণসুখদুঃখাদ্যৈর্ব্যাধিভির্মানসৈস্তথা।
অন্যৈর্নানাবিধৈর্জীবৈঃ শস্ত্রাগ্নিজলমারুতৈঃ॥
শরীরং পীড্যতে তৈস্তৈশ্চিত্তং সংক্ষুভ্যতে ততঃ।
তথা প্রাণবিপত্তৌ তু ক্ষোভমায়াতি মারুতঃ॥
ততো দুঃখশতৈর্ব্যাপ্তং চিত্তং ক্ষুব্ধং ভবেন্নৃণাম্॥

অর্থ। যোগাগ্নিদ্বারা দগ্ধীভূত দেহ অজড় এবং শোকবর্জ্জিত হয়। অপক্ক দেহ পার্থিব ও জড়, তাই দুঃখজনক হইয়া থাকে। অপক্ক দেহী ইন্দ্রিয়সমূহকে বলপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া ধ্যানে বসিলেও, ইন্দ্রিয়-

সমূহ, তাহার বশ না মানিয়া বরং তাহাকেই বিবশ করে ও ধ্যান-বিচ্যুতি ঘটায়, এবং আরও অন্যান্য কারণেও তাঁহার ধ্যানে বাধা জন্মে ;—শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, মানসিক ব্যাধি অর্থাৎ দুশ্চিন্তাসমূহ দ্বারা, মশক, পিপীলিকা, উকুন, ছারপোকা ও সরীসৃপাদি নানাবিধ জন্তুদ্বারা, এবং শস্ত্র, অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি দ্বারা শরীর পীড়াক্রান্ত হওয়ায় চিত্ত ক্ষুভিত হয়। চিত্ত ক্ষুভিত হইলে প্রাণবিপত্তি ঘটে অর্থাৎ প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠে ; প্রাণ চঞ্চল হইলেই বায়ু ক্ষুভিত হয়। এইরূপ শত শত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া মানবের চিত্ত ক্ষোভপ্রাপ্ত হয়।

বাবা! যোগের দ্বারা যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, এইরূপ যোগীকে এইরূপ দুঃখাদি বিচলিত করিতে পারে না ; কারণ যোগী যোগদ্বারা শরীর ও মনকে জয় করাতে শরীরজাত সুখদুঃখাদি তাঁহার চিত্তকে ক্ষুভিত করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপে স্থিরচেতা যোগীই জ্ঞানবিচার দ্বারা আত্মসমাহিত হইতে পারেন।

গীতায় আছে, মুক্তিসাধনের নিষ্ঠা দুই প্রকার ; আত্মানাত্মবিষয়-বিবেকীদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মীদের জন্য কর্ম্মযোগ *। কিন্তু গীতায় ভগবান্ সাধনার্থীদিগের জন্য কর্ম্মযোগকেই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ও সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং যোগশাস্ত্রোক্ত আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদিরূপ কর্ম্ম বিহিত আছে। বেদেও প্রাণায়ামাদিরূপ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি লুপ্তপ্রায়। অতএব সন্ধ্যা ও বন্দনাদি এবং সদ্‌গুরূপদিষ্ট প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পর আত্মানাত্মবিষয়-বিবেকবান্ জ্ঞানী জীবেশ্বরের অভেদ চিন্তাদ্বারা অখণ্ডচৈতন্যরূপী পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি করিবেন। যোগশিখা শ্রুতিতে আছে,—

* "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্।"

"জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোঽপি ধর্ম্মজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিনা দেহেঽপি যোগেন ন মোক্ষং লভতে বিধে॥"

অর্থ। হে বিধে! সাধক যদি জ্ঞাননিষ্ঠ, বিরক্ত, ধর্ম্মজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয়ও হয়, তথাপি যোগভিন্ন (অর্থাৎ যোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন) এই দেহদ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

বৎস! আমকুম্ভে অর্থাৎ কাঁচা মেটে কলসীতে জল রাখিলে যেমন তাহা ক্রমশঃ চুয়াইয়া নিঃসৃত হইয়া যায় এবং কলসীটীও নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ যোগহীন দেহ নানা রোগাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া চিত্তকে চঞ্চল করে, এবং ক্রমশঃ শরীরও অকালে নষ্ট হইয়া যায়। পক্ব ও অপরিপক্ব ভেদে দেহ দুই প্রকার। যোগাগ্নিদ্বারা দগ্ধীভূত দেহ পক্ব এবং যোগহীন দেহ অপক্ব। যোগ (আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামাদি) দ্বারা শরীর ও মন স্থির হইলে আত্মানাত্ম-বিবেকবান্ জ্ঞানী নির্ব্বিঘ্নে আত্ম-সমাধিস্থ হইতে পারেন। আসনদ্বারা শরীরের স্থিরতা, মুদ্রাদ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, প্রাণায়ামদ্বারা শরীরের লঘুতা ও নাড়ীশুদ্ধি, প্রত্যাহারদ্বারা চিত্তের অন্তর্ম্মুখী গতি, ধারণা ও ধ্যানদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা এবং সমাধিদ্বারা চিত্ত বা মনের নিরুদ্ধতা লাভ হয়।

দেখ বাবা! যোগশাস্ত্রাদি ভিন্ন বেদান্তাদিশাস্ত্রেও আছে যে, সাধনচতুষ্টয় ভিন্ন কেবল জ্ঞানদ্বারা আত্মসমাহিত হইতে পারা যায় না। সাধনচতুষ্টয়দ্বারা যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, এমন প্রশান্ত, ধীর ও বিনীত শিষ্যকেই গুরু অপরোক্ষ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়ীভূত তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করিবেন।

"প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় চ
প্রহীনদোষায় যথোক্তকারিণে।

গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা
প্রদেয়মেতৎ সততং মুমুক্ষবে ॥”

[বেদান্তসারঃ]

অর্থ। যিনি প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত সাধনাদিদ্বারা শান্তি বা একাগ্রতা লাভ করিয়াছে, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তপস্যাদ্বারা যাঁহার পাপ ক্ষালন হইয়াছে এবং যিনি স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারী, এমন যে গুণবিশিষ্ট ও সর্ব্বদা গুরুর অনুগত মুমুক্ষু, তাঁহাকেই এই বেদান্তজ্ঞান সতত উপদেশ করিবে।

হে পুত্র! যেমন মলিন বসনে রং লাগাইলে রং লাগে না, তেমনই অশুদ্ধচিত্তে উপদেশ শুনিলে বা আত্মানাত্ম বিচার করিলে কোন ফল হয় না,—কেবল টিয়াপাখীর মত বুলি শিক্ষা হয় মাত্র। যেমন টিয়াপাখী 'রাধাকৃষ্ণ' প্রভৃতি কত বুলিই শিখে ও বলে, কিন্তু বিড়ালে ধরিলে স্বজাতীয় বুলি 'ট্যাঁ ট্যাঁ' ভিন্ন অন্য বুলি বলে না, তদ্রূপ অশুদ্ধচিত্তে যাহারা জ্ঞানবিচার করে তাহাদের কেবল মুখে মুখেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম) ইত্যাদি বলা; কিন্তু তাহারা দুঃখে পড়িলে 'আমি মরিলাম', 'আমি গেলাম', 'আহা, উহু' ইত্যাদি অজ্ঞানীর মত, কত প্রলাপই বকিতে থাকে।

শিষ্য। গুরুদেব! সাধনচতুষ্টয় কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। বৎস! বিবেক, বৈরাগ্য, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এই চারি প্রকার সাধনকে 'সাধনচতুষ্টয়' কহে।

প্রথম সাধন—'নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ'। একমাত্র অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই নিত্য, এতদ্ভিন্ন আর সবই অনিত্য, এইরূপ বিবেচনা করা।

দ্বিতীয় সাধন—'ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ'। নিত্যানিত্যবস্তু বিচার দ্বারা নিত্যবস্তুর জ্ঞান দৃঢ়তর হইলে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগে

বিতৃষ্ণা জন্মে। ঐহিক গন্ধ-মাল্য-বনিতাদি ভোগ্য বিষয় যত্নসাধ্য (জন্য-পদার্থ) বলিয়া অনিত্য; সেইরূপ পারলৌকিক স্বর্গাদিসুখভোগও যত্নসাধ্য (জন্যপদার্থ) বলিয়া অনিত্য। এইরূপে বিষয়ের অনিত্যত্ব বা নশ্বরত্ব জানিতে পারিয়া তৎপ্রতি যে বিতৃষ্ণা, তাহাই বৈরাগ্য।

তৃতীয় সাধন—'শমদমাদিষট্‌সম্পত্তিঃ'।

(১) শম—ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিষয়ে শ্রবণ ভিন্ন সংসারসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় হইতে মনের যে সংযম এবং ব্রহ্ম বা ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণাদিতে মনের যে প্রবর্ত্তন তাহাই শম।

(২) দম—বাহেন্দ্রিয় (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়)কে বিষয় হইতে আবর্ত্তনপূর্ব্বক স্ব স্ব গোলকে অর্থাৎ স্ব স্ব আধারে সংস্থাপন করার নাম দম; অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়কে সংযম করার নাম দম। দশ ইন্দ্রিয় যথা—বাক্ (বাক্য), পাণি (হস্ত), পাদ (পা), পায়ু (গুহ্য) ও উপস্থ (লিঙ্গ) এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়।

(৩) উপরতি—বিষয়প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া গেলে, যাহাতে পুনরায় বিষয়প্রবৃত্তি জাগরিত হইতে না পারে এইরূপ করা, অথবা শাস্ত্রীয় বিধানমতে কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করাকে উপরতি কহে।

(৪) তিতিক্ষা—শরীরকে নষ্ট না করিয়া শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহ্য করা।

(৫) শ্রদ্ধা—গুরুতে ও তদুপদিষ্টবিষয়ে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।

(৬) সমাধান—ঈশ্বরে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান।

চতুর্থ সাধন—'মুমুক্ষুত্বম্'। 'আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি বা মোক্ষ; তৎপ্রাপ্তির ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব (মোক্ষেচ্ছা) কহে।

শিষ্য। গুরুদেব! যাহারা যোগভিন্ন শুধু জ্ঞানের চর্চ্চা করে, তাহাদের পরিশ্রম কি ভস্মে ঘৃতাহুতির মত একেবারেই ব্যর্থ হয়?

গুরু। না বৎস, তাহা হইবে কেন? জ্ঞানী, মৃত্যুর পর, ইহজন্মকৃত পুণ্য ও পাপের ফল ভোগ করেন। এইরূপে পুণ্য ও পাপ ভোগান্তে জ্ঞানী পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে প্রাক্তন পুণ্য (অর্থাৎ জ্ঞানচর্চ্চার) ফলে সিদ্ধযোগীর সঙ্গলাভ হয়। তখন সিদ্ধযোগীর কৃপায় সেই জ্ঞানী সিদ্ধযোগ প্রাপ্ত হন। তাহার ফলে তাঁহার অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা নষ্ট হইলেই স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ আত্মা প্রকাশিত হন। *

শিষ্য। আচ্ছা, যদি কোন সাধক জ্ঞানচর্চ্চা না করিয়া কেবল যোগানুশীলন করেন, তাঁহারও কি, জ্ঞানীর মত, জন্মান্তরে জ্ঞানলাভান্তর মুক্তিলাভ করিতে হইবে?

গুরু। না বৎস! জ্ঞানী যেমন বহুজন্মাবধি জ্ঞানাভ্যাসের ফলে যোগলাভ করেন যোগীর তাহা করিতে হয় না। যোগী যোগসাহায্যে এক জন্মেই জ্ঞানপ্রাপ্ত হন এবং তৎপরে মুক্তিলাভ করেন। কাজেই যোগের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোক্ষদায়ক উপায় আর নাই। এক জন্মের শরীরদ্বারাই ধীরে ধীরে যোগাভ্যাস করিয়া যোগী দীর্ঘকাল পরে মর্কটক্রমে মুক্তিলাভ করেন। †

* "দেহান্তে জ্ঞানিভিঃ পুণ্যাৎ পাপাচ্চ ফলমাপ্যতে।
ঈদৃশং তু ভবেত্তত্তদ্ভুক্ত্বা জ্ঞানী পুনর্ভবেৎ॥
পশ্চাৎ পুণ্যেন লভতে সিদ্ধেন সহ সঙ্গতিম্।
ততঃ সিদ্ধস্য কৃপয়া যোগী ভবতি নান্যথা॥
ততো নশ্যতি সংসারো নান্যথা শিবভাষিতম্॥"
[যোগশিখোপনিষৎ]

† "জ্ঞানং তু জন্মনৈকেন যোগাদেব প্রজায়তে।
তস্মাদ্‌যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্তু মোক্ষদঃ॥

শিষ্য।—হে পিতঃ! 'মর্কটক্রমে মুক্তি' এই কথার তাৎপর্য্য আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। দেখ বৎস! বানর যেমন শাখা হইতে শাখান্তরে এবং বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উল্লম্ফনদ্বারা অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে অভিলষিত বৃক্ষের অগ্রভাগস্থিত ফলপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগী সিদ্ধযোগ-সাহায্যে প্রাণবায়ুকে সুষুম্নামার্গে প্রবেশিত করিয়া চক্র হইতে চক্রান্তরে লইয়া যায়; এইরূপে ষট্চক্র ভেদ করিয়া এই শরীরবৃক্ষের অগ্রভাগ (ব্রহ্মতালু)-স্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে মন ও প্রাণকে রোধপূর্ব্বক অখণ্ডজ্ঞান সাক্ষাৎকার করিয়া মুক্তিলাভ করেন। ইহারই নাম 'মর্কটক্রমে মুক্তি'।

আমার পরম বন্ধু, মাদারীপুর জ্ঞানসাধন মঠের শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ স্বামী 'মর্কটক্রমে মুক্তি', ইহার তাৎপর্য্য অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন শ্রবণ কর। 'মর্কট' শব্দের অর্থ—ঊর্ণনাভ গুটীপোকা। ঊর্ণনাভ গুটীপোকার ক্রমান্বয়ে চারিটী অবস্থা লাভ হয়। (১) সে প্রথমতঃ মাতৃগর্ভ হইতে প্রসূত হইয়া কৃমিকীটের আকারে দেখা দেয় এবং আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিয়া উৎকৃষ্টতর দেহলাভের প্রতি বাঞ্ছা করিয়া থাকে। তারপর (২) কিছু বড় হইলে সে 'মর্কট' বা ঊর্ণকীট হইয়া উঠে। এই অবস্থায় সে যেন দীর্ঘকাল সমাধিস্থ থাকিবার প্রয়োজনবশতঃ নিজ দেহকে শত্রু ও শীতবাতাদির অগম্য করিয়া রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই স্বদেহ হইতে ঊর্ণা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় শরীরের চারিদিকে একটী বেষ্টনী নির্ম্মাণ করিতে থাকে। (৩) ইহার পর ঐ বেষ্টনী বা গুটির মধ্যে অবস্থান কালে বাহ্যবিষয়সম্পর্ক রহিত হওয়ায়

একেনৈব শরীরেণ যোগাভ্যাসাচ্ছনৈঃ শনৈঃ।
চিরাৎ সংপ্রাপ্যতে মুক্তির্ম্মর্কটক্রম এব সঃ॥"

[যোগশিখোপনিষৎ]

নিশ্চয়ই একমাত্র বাঞ্ছিত বিষয়ে (অর্থাৎ প্রবলতর জীবগণের অগম্য স্বাধীন দেহ লাভের প্রতি) তাহার চিত্ত লয় হইয়া থাকে। (৪) এই-রূপে গভীর সমাধির পর তাহার পক্ষোদ্গম হয়, এবং সে তখন গুটি কাটিয়া সুন্দর প্রজাপতির আকারে দেখা দেয় ও সুখে মুক্তাকাশে বিচরণ করে। সিদ্ধযোগপ্রাপ্ত যোগীরও এইরূপ ক্রমান্বয়ে চারিটী অবস্থা লাভ হইয়া থাকে, তাহাই যোগচতুষ্টয় ;—তিনি (১) মন্ত্রযোগদ্বারা ইষ্ট (অর্থাৎ বাঞ্ছিত) বস্তুর দৃঢ় সংস্কার লাভ করেন, (২) হঠযোগদ্বারা স্বদেহকে শীতাতপপীড়নাদির দুর্ভেদ্য করেন, (৩) লয়যোগদ্বারা চিত্তকে অবান্তর বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া ইষ্টবস্তুতে একাগ্র হইয়া থাকেন ; (৪) তৎপরে রাজযোগদ্বারা মোক্ষলাভ করেন। সুতরাং এই যোগচতুষ্টয় একই সিদ্ধযোগের বিভিন্ন অবস্থামাত্র,—পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমানু-যায়ী বিভাগমাত্র।

শিষ্য। পিতঃ! আপনার প্রসাদে বুঝিলাম যে, মুক্তিলাভ করিতে হইলে যোগ ও জ্ঞান উভয়ই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করা প্রয়োজন। কিন্তু এখন দুইটী বিষয়ে আমার মনে সংশয় আসিতেছে ;—(১) যদি শ্রদ্ধা-বান্ সাধক যোগপথ প্রাপ্ত হইয়া তৎসিদ্ধির পূর্ব্বেই চিত্তচাঞ্চল্য বা ইন্দ্রিয়বৈকল্যবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন, তবে মৃত্যুর পর তাঁহার কিরূপ গতি হইবে ? (২) অথবা যদি কোন সাধক যোগপথে নিষ্ঠাবান্ থাকিয়াও সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারই বা কিরূপ গতি হইবে ?

গুরু। বৎস! তোমার প্রশ্ন শুনিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। তোমার কৌতূহলনিবারণার্থ বিশদভাবে তাহার উত্তর দিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, সেই যোগভ্রষ্ট সাধকের ইহলোকে বা

পরলোকে বিনাশ (অধোগতি) হয় না; কল্যাণকর্ম্মকারী জনের কখনও দুর্গতি হয় না। যিনি যোগপথ প্রাপ্ত হইয়াও, সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই চিত্তচাঞ্চল্য বা ইন্দ্রিয়বৈকল্যবশতঃ যোগভ্রষ্ট হন, সেই সাধক মৃত্যুর পর পুণ্যবান্‌দিগের লভ্য স্বর্গসুখ দীর্ঘকাল ভোগ করিয়া, শুচি ধনবান্‌দিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর বিশুদ্ধভাবে বিষয়ভোগপূর্ব্বক, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ পুনরায় যোগপ্রাপ্তিবিষয়ে অধ্যবসায় করিয়া থাকেন। আর যোগে শ্রদ্ধাবান্ সাধক যদি তৎসিদ্ধির পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন, তবে মৃত্যুব পর তাঁহার যোগীর ঘরে জন্মলাভ হয়। এইরূপ জন্ম বড়ই দুর্লভ। এইরূপ জন্মলাভবশতঃ যোগীর সংসর্গে তাঁহার পূর্ব্বদেহজাত যোগবুদ্ধি অঙ্কুর জাগরিত হইয়া উঠে, এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারবশে, যেন অবশ হইয়াই, তিনি পুনর্ব্বার সম্যক্ সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান্ হন। *

যোগশিখোপনিষদেও আছে,—যদিও দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যোগপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই সাধকের দেহপাত হয়, তাহা হইলে ঐ সাধককে পূর্ব্ববাসনানুযায়ী শরীর ধারণ করিতে হয়। তৎপরে যোগজনিত

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাতগচ্ছতি ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং ॥
তত্রতং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ ॥"

পুণ্যবশতঃ সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ হয় এবং তাঁহার কৃপায় পশ্চিমমার্গে অর্থাৎ সুষুম্নাপথে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হওয়ায় সত্বরই তাঁহার যোগসিদ্ধি-রূপ ফল উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত যোগাভ্যাসবশতঃই সত্বর ঐরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে। ইহাই একমাত্র জানিবার বিষয়; যোগিগণ ইহাকে 'কাকমত' বলিয়া থাকেন। কাকমতরূপ যোগাভ্যাস অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ অভ্যাস আর কিছুই নাই। কেননা এতদুপায়দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; ইহাতে কোন সংশয় নাই; ইহাই শিবের উক্তি। *

শিষ্য। গুরুদেব! 'কাকমত' কি, আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। যেমন কাক উভয়চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিকে একীভূত করিয়া তাহার লক্ষ্য বস্তুতে স্থাপনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে, সেইরূপ উত্তমসাধক যোগ ও জ্ঞান এতদুভয়কে একমাত্র মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতি কেন্দ্রীভূত করিয়া সাধনাপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এইজন্য এইরূপ যোগ ও জ্ঞানের সমবায়-সাধনকে 'কাকমত' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বৎস! এখন বুঝিলে ত, যোগসাধকের, ইহকালে কি পরকালে, কখনও দুর্গতি হয় না। এইজন্য সকলেরই যোগবিষয়ে যত্নপর হওয়া

---

* "যোগসিদ্ধিং বিনা দেহঃ প্রমাদাদ্‌যদি নশ্যতি।
পূর্ব্ববাসনয়া যুক্তঃ শরীরং চান্যথাপ্নুয়াৎ ॥
ততঃ পুণ্যবশাৎ সিদ্ধগুরুণা সহ সঙ্গতঃ।
পশ্চিমদ্বারমার্গেণ জায়তে ত্বরিতং ফলম্ ॥
পূর্ব্বজন্মকৃতাভ্যাসাৎ সত্বরং ফলমশ্নুতে।
এতদেব হি বিজ্ঞেয়ং তৎকাকমতমুচ্যতে ॥
নাস্তি কাকমতাদন্যদভ্যাসাখ্যমতঃ পরম্।
তেনৈব প্রাপ্যতে মুক্তির্নান্যথা শিবভাষিতম্ ॥"

কর্ত্তব্য। একমাত্র যোগদ্বারা "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান"বৎ সকল বিষয়েরই জ্ঞানলাভ হয়। শিব বলিয়াছেন,—

"আলোক্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং যোগশাস্ত্রং পরং মতম্॥
যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতি নিশ্চিতম্।
তস্মিন্ পরিশ্রমঃ কার্য্যঃ কিমন্যৎ শাস্ত্রভাষিতম্॥"

[শিবসংহিতা]

অর্থ। সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ বিচারদ্বারা একমাত্র ইহাই সুনিষ্পন্ন হইয়াছে যে, যোগশাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেননা ইহাতে জ্ঞানলাভ হইলেই, এই সমস্ত জগতের নিশ্চিত জ্ঞানলাভ হয়। সুতরাং এই যোগবিষয়েই সকলের পরিশ্রম করা উচিত, অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রয়োজন কি?

এইজন্যই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগীকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিয়া অর্জ্জুনকে যোগী হওয়ার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥"

[শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা]

অর্থ। যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।

বৎস! এমন কি যোগবিষয়ে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরও পরম ফল লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবদ্‌বাক্যেই আছে,—

"জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥"

অর্থ। যোগবিষয়ে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও শব্দব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডকে অতিক্রম করেন।

বাস্তবিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, যখন তাহার ও তৎফলভূত স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখভোগের প্রতি অনাস্থা জন্মে, তখনই মানুষ ইহামুত্রার্থফলভোগে বিরক্ত হইয়া যোগপথের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। এইজন্যই বলিতে হয় যে, যখনই কোন ব্যক্তির যোগজিজ্ঞাসা, অর্থাৎ যোগপন্থান্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে, তখনই তাহার কর্ম্মকাণ্ড ও তৎফল অতিক্রান্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিবৃতি

শিষ্য। করুণাসিন্ধো! যোগ কি এবং তাহা কি উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে, তাহা এখন আপনার প্রসাদে জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হে পুত্র! তোমার যোগবিষয়ে কৌতূহল ও আগ্রহ দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। তোমার আগ্রহবৃদ্ধি করিবার জন্য তাহা বিশদ-ভাবে বর্ণনা করিতেছি। তুমি যোগ ও তদুপায় জানিয়া সাধনায় মগ্ন হইতে পারিলেই আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

"যোঽপানপ্রাণয়োরৈক্যং স্বরজোরেতসোস্তথা।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ॥
এবং তু দ্বন্দ্বজালস্য সংযোগো যোগ উচ্যতে॥"

[যোগশিখোপনিষৎ]

অর্থ। প্রাণ ও অপানের একতা, নিজের গুহ্যদেশস্থ রক্তবর্ণ শক্তি ও তালুদেশস্থ শুক্লবর্ণ শক্তির মিলন, নাভিস্থ সূর্য্য ও মস্তকস্থ চন্দ্রের সংযোগ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে একীভাব, তাহাই 'যোগ'; এইরূপ যে দুই দুইটী তাহাদের সংযোগকেই 'যোগ' কহে।

দেবীভাগবতে আছে—

"ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ॥"

অর্থ। যোগ স্বর্গেও নাই, মর্ত্ত্যেও নাই এবং পাতালেও নাই; যোগবিশারদগণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একতাসাধনকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বৎস! সাধারণভাবে 'যোগ' বলিতে আমরা কি বুঝি? মনে

কর, কতগুলি বিভিন্ন সংখ্যা আছে, যেমন ১,২,৩,৪ ইত্যাদি তাহাদের একীকরণকেই 'যোগ' বলিয়া বুঝিয়া থাকি। তদ্রূপ এই দৃশ্যমান জগতে এই যে বিভিন্ন প্রকারের নাম ও রূপ, তাহাদের একীকরণের অর্থাৎ একে লয় করার নামই যোগ। এই বিভিন্ন নাম ও রূপ মনে বা চিত্তে বর্ত্তমান; এইজন্য একমাত্র মন বা চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারাই যোগ সাধিত হয়। পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে,—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"

হে বৎস! চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে পূর্ব্বকথিত দ্বন্দ্বসমূহেরও যোগ আপনা হইতেই হইয়া যায়, কেননা চিত্তবৃত্তি থাকাতেই একত্বে বহুত্বের দর্শন হইতেছে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মা বৃত্তিস্থ থাকার জন্য চিত্তের চঞ্চলতায় চঞ্চল, স্থিরতায় স্থির, সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী এবং পরিণামে পরিণামী বলিয়া বোধ হইতেছে। বাস্তবিক আত্মাতে এই সব ধর্ম্ম নাই। যেমন রক্তজবাফুল স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট থাকিয়া আপনার লৌহিত্য স্ফটিকে আরোপিত করে, তদ্রূপ চিত্ত নিজ ধর্ম্ম চৈতন্যস্বরূপ নির্ব্বিকার আত্মায় আরোপিত করিতেছে। যেমন জবা নিজ ধর্ম্ম স্ফটিকে আরোপিত করে বলিয়া স্ফটিকের উপাধি, তদ্রূপ চিত্তও চৈতন্য-স্বরূপ আত্মার উপাধি। উপাধির লয়েই উপহিতের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তাই চিত্তবৃত্তি নিরোধের প্রয়োজন; চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলেই চিতিশক্তি অর্থাৎ আত্মা স্বরূপে অবস্থান করিবে। সুতরাং সর্ব্ব অনর্থের মূল চিত্তের যত্নসহকারে চিকিৎসা করাই প্রথম প্রয়োজন, কেননা চিত্তেই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ এই জগত্রয় বর্ত্তমান, চিত্ত ক্ষয় হইলেই জগৎও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। *

হে পুত্র! সর্ব্বজীবস্থিত চিত্ত প্রাণবায়ুদ্বারা সুসংবদ্ধ হইয়া অবস্থান

---

* "চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্ সতি জগত্রয়ম্।
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তৎ চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ॥"

করে। পক্ষী যেমন রজ্জুদ্বারা সুসংবদ্ধ থাকে, তদ্রূপ চিত্তও প্রাণবায়ু-দ্বারা সুসংবদ্ধ আছে। নানাবিধ বিচারে মন বশীভূত হয় না; সুতরাং মনকে বশীভূত করিতে হইলে প্রাণকে জয় করিতে হইবে। *

বাস্তবিক প্রাণস্পন্দনই চিত্ত, প্রাণস্পন্দ রহিত হইলে চিত্তও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

চিত্ত ও মন একই, কোন বিশেষ পার্থক্য নাই, মনে রাখিও। যেখানে মন উল্লেখ করা হইবে, সেখানে চিত্তই বুঝিয়া লইও। এখন কি উপায়ে প্রাণকে জয় করা যায়, তাহা বলিতেছি।

একমাত্র সিদ্ধোপায় ভিন্ন তর্ক, জল্প, বিবিধ শাস্ত্রবাক্য, যুক্তি, মন্ত্র বা ঔষধদ্বারা প্রাণবায়ুকে জয় করা যায় না। †

হে বৎস! সিদ্ধোপায়, সিদ্ধিমার্গ বা সিদ্ধযোগ একই। ইহা (অর্থাৎ সিদ্ধিমার্গ) কি, তাহা প্রথম বিবৃতির দিন তোমাকে বিশদভাবে বুঝাইয়াছি, বোধ হয় তাহা তোমার স্মরণ আছে। গুরু, নিজ সাধন-শক্তি শিষ্যে সঞ্চারদ্বারা শিষ্যের যোগশক্তির (কুণ্ডলিনীশক্তির) উদ্বোধন করিলে পর, তদুপদিষ্ট মন্ত্রজপ বা ধ্যানদ্বারাই যে স্বাভাবিক যোগ লাভ হয় তাহাই সিদ্ধোপায়। কুলার্ণব তন্ত্রে এইরূপ দীক্ষাকে 'বেধদীক্ষা' বলা হইয়াছে। সদাশিব দেবীকে কহিয়াছেন,—

---

* "চিত্তং প্রাণেন সংবদ্ধং সর্ব্বজীবেষু সংস্থিতম্।
রজ্জ্বা যদ্বৎ সুসংবদ্ধঃ পক্ষী তদ্বদিদং মনঃ॥
নানাবিধৈর্বিচারৈস্তু ন বাধ্যং জায়তে মনঃ।
তস্মাত্তস্য জয়োপায়ঃ প্রাণ এব হি নান্যথা॥"
[যোগশিখোপনিষৎ]

† "তর্কৈর্জল্পৈঃ শাস্ত্রজালৈর্যুক্তিভির্মন্ত্রভেষজৈঃ।
ন বশো জায়তে প্রাণঃ সিদ্ধোপায়ং বিনা বিধে॥"

"আজানুনাভিহৃৎকণ্ঠতালুমূর্দ্ধান্তমম্বিকে।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ বেধং কুর্য্যাদ্‌বিচক্ষণঃ॥"

অর্থ। হে অম্বিকে! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুর উপদেশ অনুসারে জানু হইতে নাভি, নাভি হইতে হৃদয় ও কণ্ঠ এবং কণ্ঠ হইতে তালু ও মূর্দ্ধাকে বিদ্ধ করিবে।

গুরূপদিষ্ট মন্ত্র অথবা গুরুর স্পর্শ, দৃষ্টি ও মননদ্বারাই শিষ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়। সঞ্চারিত শক্তি শিষ্যের ষট্‌পদ্মাদি বিদ্ধ করিয়া তাহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করে।

"সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্ত্তি কুণ্ডলী।
তদা সর্ব্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ॥"
[হঠযোগপ্রদীপিকা]

অর্থ। যখন শ্রীগুরুর প্রসাদে মূলাধারস্থা নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হন, তখন ষট্‌পদ্ম এবং ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্রগ্রন্থি ক্রমশঃ ভেদ হইয়া যায়।

তিনটী গ্রন্থি তিন গুণের স্থান; শক্তি তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ হইলে সাধকের দিব্যজ্ঞান (অখণ্ডচৈতন্যের বোধ) হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার কৃপায় এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, একমাত্র গুরু-সঞ্চারিত শক্তিদ্বারা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইলে, আপনা হইতেই যোগক্রিয়া (আসনপ্রাণায়ামাদি) হইতে থাকিবে এবং তৎপরে সাধককে যোগ অর্থাৎ জীবব্রহ্মাঐক্যজ্ঞান প্রদান করিবে। এখন স্পর্শ, দৃষ্টি ও মননদ্বারা কিরূপে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা জানিবার কৌতূহল হইতেছে।

গুরু। হে পুত্র! তুমি যে আমার কথার ভাবগুলি বুঝিতে পারিতেছ, ইহাতে আনন্দ অনুভব করিতেছি। স্পর্শ, দৃষ্টি ও মনন এই

ত্রিবিধ উপায়ে যে কি ভাবে বেধদীক্ষা বা শক্তিসঞ্চার হয়, তাহা শুন। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে—

"যথা পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাং শিশূন্ সম্বর্দ্ধয়েচ্ছনৈঃ।
স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥"

অর্থ। পক্ষী যেমন নিজপক্ষদ্বয়দ্বারা ডিম্বমধ্যস্থ শাবকগুলিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করে, গুরু সেইরূপ স্পর্শদ্বারা শিষ্যের অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন; ইহাকেই স্পর্শদীক্ষা বা স্পর্শদ্বারা শক্তিসঞ্চার কহে।

"স্বাপত্যানি যথা মৎস্যো বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ।
দৃগ্ভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥"

অর্থ। মৎস্য যেমন কেবল দৃষ্টিদ্বারাই নিজ অপত্যগুলিকে পোষণ করে, সেইরূপ গুরু কেবল দৃষ্টিদ্বারাই শিষ্যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন, এইরূপ শক্তিসঞ্চারকে দৃগ্দীক্ষা কহা যায়।

"যথা কূর্ম্মঃ স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেণ পোষয়েৎ।
বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাৎ তথাবিধঃ॥"

অর্থ। কূর্ম্ম (কচ্ছপ) যেমন চিন্তাদ্বারাই ভূগর্ভস্থ ডিম্বগুলিকে ফুটাইয়া তুলে, সেইরূপ গুরু কেবল মননদ্বারাই শিষ্যের শক্তি জাগরিত করিয়া থাকেন; এই প্রকার যে বেধদীক্ষা বা শক্তিসঞ্চার ইহাই মানসদীক্ষা।

বায়বীয় সংহিতায় এই বেধদীক্ষাকেই 'শাম্ভবী দীক্ষা' বলা হইয়াছে,—

"গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি।
সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তোর্দীক্ষা সা শাম্ভবী মতা॥"

অর্থ। গুরুর দৃষ্টি, স্পর্শ অথবা বাক্য দ্বারা যে সদ্যঃই একটা জ্ঞান (অনুভূতি) জন্মে, তাহাই শাম্ভবী দীক্ষা বলিয়া কথিত।

অতএব বেধদীক্ষা, শাম্ভবী দীক্ষা ও সিদ্ধযোগ এই তিনই এক, এবং ইহা শক্তিসঞ্চারদ্বারাই সম্পন্ন হয়।

"শক্তিপাতানুসারেণ শিষ্যোঽনুগ্রহমর্হতি।
যত্র শক্তির্ন পততি তত্র সিদ্ধির্ন জায়তে॥"

[কুলার্ণবতন্ত্রম্]

অর্থ। শক্তিসঞ্চারদ্বারাই শিষ্য অনুগ্রহলাভে সমর্থ হয়। যেখানে শক্তিসঞ্চার হয় না, সেখানে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

বৎস! যেমন পিতৃবিন্দু মাতৃরজে মিলিত হইলে যথাকালে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ গুরুশক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার অভ্যন্তরস্থ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিলেই, যথাকালে জ্ঞানরূপ সন্তান উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। গর্ভসঞ্চারের পর গর্ভিনী স্ত্রীর যেমন গর্ভটী রক্ষার ও সুপ্রসবের জন্য, বিশেষ সাবধানে আচার-নিয়মাদি পালনপূর্ব্বক ভ্রূণকে বর্দ্ধিত হওয়ার সুবিধা দান করিতে হয়, নতুবা গর্ভ নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে; তেমনই শক্তিসঞ্চারের পর শিষ্যের পক্ষেও জ্ঞানোৎপত্তির জন্য, গুরূপদিষ্ট আচারনিয়মাদি পালনপূর্ব্বক, ঐ উদ্বুদ্ধ শক্তিকে উন্নতিলাভের সুবিধা দান করিতে হয়, নতুবা জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে সফলতা লাভের সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য। দেব! শিষ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইলে, তাহার কোন প্রকার অনুভব হইবে কি? না, কেবল গুরুবাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়াই মনে করিতে হইবে যে, আমাতে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে?

গুরু। হে বৎস! শক্তিটী দেখা যাইবে না বটে, কিন্তু তাহার কার্য্যানুভবের দ্বারা আপনা হইতেই বিশ্বাস আসিবে যে, আমাতে শক্তিসঞ্চারিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বেই বায়বীয় সংহিতার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, 'শাম্ভবী দীক্ষা' বা শক্তিসঞ্চার দ্বারা সদ্যঃই

একটা অনুভূতি জন্মে। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে, 'বেধদীক্ষা' প্রাপ্ত হইলে শিষ্যের ক্রমশঃ আনন্দ, কম্প, আসন হইতে উত্থান বা দার্দুরী গতি, ঘূর্ণা, নিদ্রা ও মূর্চ্ছা এই ষড়্‌বিধ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকিবে*। শক্তি সঞ্চারিত হইলে কাহারও এতন্মধ্যে একটী, ততোঽধিক বা সমস্ত লক্ষণগুলিই অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ পায়। যোগশিখোপনিষদে 'সিদ্ধযোগ'প্রাপ্তির লক্ষণ কেবল কম্পানুভূতিই বর্ণিত হইয়াছে।

"যদানুধ্যায়তে মন্ত্রং গাত্রকম্পোঽথ জায়তে।"

অর্থ। গুরূপদিষ্ট মন্ত্র ধ্যান বা জপ করিলেই শরীরে কম্প উপস্থিত হয়।

হে বৎস! এইরূপ অনুভূতিমূলক যে সাধনা, তাহাই সাধককে ক্রমশঃ সিদ্ধির দিকে অগ্রসর করাইতে থাকে। সাধনা করিতেছি, অথচ কোন অনুভব নাই, এমন অবস্থায় সাধনা করিতে সাধকের তীব্র উৎসাহ কিভাবে আসিতে পারে? কাজেই দেখা যায় যে, অনেকে প্রথম অবস্থায় তীব্র উৎসাহের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, অনুভূতির অভাবে পরে একেবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে, এবং সাধনা হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া থাকে। দেখ বৎস! যেমন কেহ তোমাকে বলিল "এই সরোবরে মৎস্য আছে, তুমি ছিপ ফেল, মৎস্য পাইবে।" তুমি তদনুসারে প্রত্যহ ছিপ ফেলিতে থাকিলে, এইরূপে ১০-১২ দিন চলিয়া গেল, কিন্তু কোন মৎস্যের সাড়াও পাইলে না; তখন আর ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় কি? মৎস্য ধরিতে না পারিলেও যদি সামান্যভাবে সাড়াও পাওয়া যায়, তখন মনে বিশ্বাস আসে যে, ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকিলে একদিন না একদিন মৎস্য ধরিতে সমর্থ

---

* 'আনন্দশ্চৈব কম্পশ্চোদ্ভবো ঘূর্ণা কুলেশ্বরি।
নিদ্রা মূর্চ্ছা চ বেধস্য ষড়বস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

হইবই। তদ্রূপ সাধনা করিতে আরম্ভ করিলাম, অথচ কোন অনুভূতি নাই, এমন অবস্থায় ধৈর্য্য ধরিয়া সাধনা করিতে ভাল লাগে কি? বাস্তবিক অনুভূতিমূলক সাধনা না হইলে সাধক কখনও সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। যোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্যাসদেব তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যদ্যপি হি তত্তচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশৈরবগতমর্থতত্ত্বং সদ্ভূতমেব ভবতি এতেষাং যথাভূতার্থপ্রতিপাদনসামর্থ্যাৎ তথাপি যাবদেকদেশোঽপি কশ্চিন্ন স্বকরণসংবেদ্যো ভবতি তাবৎ সর্ব্বং পরোক্ষমিব অপবর্গাদিষু সূক্ষ্মেষর্থেষু ন দৃঢ়াং বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্য্যোপদেশো-পোদ্বলনার্থমেবাবশ্যং কশ্চিদ্বিশেষঃ প্রত্যক্ষীকর্ত্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈক-দেশপ্রতক্ষত্বে সতি সর্ব্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ-অপবর্গাৎ সুশ্রদ্ধীয়তে।"

অর্থ। আগম, অনুমান ও গুরুবাক্যাদিরূপ প্রমাণ হইতে যে সকল বস্তুতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, সে সকলের যথার্থতা সম্বন্ধে যদিও কোন সংশয় নাই, কারণ ইহারা বস্তুর যথার্থস্বরূপই প্রতিপাদন করিয়া থাকে; তথাপি উক্ত প্রমাণাদি হইতে অবগত বিষয়সমূহের কোন এক অংশ যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষজ্ঞানগোচর না হয়, তাবৎ সে সকলই পরোক্ষবিষয় বলিয়া উহা হইতে অপবর্গাদি (মোক্ষাদি) সূক্ষ্মবিষয়সমূহে নিঃসংশয়া বুদ্ধি (বা শ্রদ্ধা) উৎপন্ন হয় না। অতএব আগম, অনুমান ও গুরু-বাক্যাদি প্রমাণ হইতে অবগত বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য উক্ত বিষয়ের কোন এক অংশ প্রথমতঃ প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। এই প্রকারে উপদিষ্ট বিষয়ের কোন একাংশও প্রত্যক্ষ হইলেই মোক্ষাদি অতি সূক্ষ্ম বিষয়সমূহেও উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।

হে বৎস! গুরুবাক্য, শাস্ত্র এবং নিজ অনুভূতি এই তিনটী যদি এক হয়, তবে তত্ত্বসম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না;

এইরূপ নিশ্চিত অনুভূতিমূলক জ্ঞানসাহায্যেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ;—এইরূপ অনুভূতিমূলক অভ্যাসদ্বারাই সাধক যথাসময়ে সত্য-স্বরূপ আত্মাকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হন। *

হে পুত্র! যিনি শক্তিসঞ্চার করেন তিনিই গুরু, এবং যাঁহাতে শক্তি সঞ্চারিত হয় তিনিই শিষ্য। এইজন্য শিষ্যকে আত্মজও কহে। শক্তিসঞ্চারকই যে গুরু তাহা শাস্ত্রেও বর্ণিত আছে।

"দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েদ্‌যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ॥"

[যোগবাশিষ্ঠ]

অর্থ। যিনি কৃপাপূর্ব্বক দর্শন, স্পর্শন কিংবা শব্দ (মন্ত্র বা উপদেশ) দ্বারা শিষ্যদেহে মঙ্গলময় অনুভূতি উৎপন্ন করিতে পারেন, তিনিই গুরু।

"গুরোর্যস্যৈব সংস্পর্শাৎ পরানন্দোঽভিজায়তে।
গুরুং তমেব বৃণুয়াৎ নাপরং মতিমান্নরঃ॥"

[কুলার্ণবতন্ত্রম্]

অর্থ। যে গুরুর সংস্পর্শদ্বারা শিষ্যে পরানন্দের উদয় হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিবে, অন্যকে নহে।

"মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা গুরুরুক্তঃ স্বয়ম্ভুবা।"

অর্থ। যিনি মন্ত্রচৈতন্য করিতে জানেন তিনিই গুরু, ইহা স্বয়ম্ভু কহিয়াছেন।

বৎস! কুণ্ডলিনীশক্তি-জাগরণ আর মন্ত্রচৈতন্য একই, ইহা মনে রাখিও।

---

* "স্বানুভূতেশ্চ শাস্ত্রস্য গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা।
যস্যাভ্যাসেন তেনাত্মা সততং চাবলোক্যতে॥"

[মহোপনিষৎ]

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি যেরূপ লক্ষণের কথা বলিলেন, এরূপ লক্ষণাক্রান্ত গুরু ত সকলের ভাগ্যে মিলা কঠিন। সে যাহা হউক, যাহারা কুল (বংশ) গুরুর নিকট অথবা অপর কোন গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছে, তাহারা যদি মন্ত্রচৈতন্য বা শক্তিসঞ্চারের জন্য পুনরায় গুরুগ্রহণ করে, তবে তাহাতে গুরুত্যাগজনিত অপরাধ হয় না ত?

গুরু। বৎস! তুমি সময়োপযোগী বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ" অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র গুরু। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুরও গুরু, তাঁহার গুরু কেহ নাই। * তাঁহার তত্ত্ব বা স্বরূপ জানিবার জন্যই মানব-গুরু করা। একজনের দ্বারা যদি তত্ত্বপিপাসা না মিঠে, তবে অন্যগুরুগ্রহণে অপরাধ নাই। কুলার্ণবতন্ত্রে আছে,—

"অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়চ্ছেদকারকম্।
গুর্ব্বন্তরন্তু গত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে॥
মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

অর্থ। অনভিজ্ঞ গুরুর নিকট সংশয়চ্ছেদন না হওয়ায়, সংশয়চ্ছেদন করিতে সমর্থ এমন অন্য গুরু আশ্রয় করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। যেমন মধুকর মধুলাভের আশায় এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানান্বেষী শিষ্য এক গুরু করিয়া পরে অন্য গুরু করিতে পারে।

শিবপুরাণে শিব বলিয়াছেন—

"যত্রানন্দঃ প্রবোধো বা নাল্পমপ্যুপলভ্যতে।
বৎসরাদপি শিষ্যেণ সোঽন্যং গুরুমুপাশ্রয়েৎ॥"

---

* "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।"
[পাতঞ্জল-যোগসূত্রম্]

অর্থ। যে দীক্ষায় শিষ্য অল্পমাত্রও আনন্দ বা প্রত্যয় উপলব্ধি করে না, সেই দীক্ষার পর একবৎসরকাল দীক্ষাগুরুর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া তাঁহাতেও যদি উহা লাভ না হয়, তবে অন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

বৎস! বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকই যে সকল বিদ্যায় পারদর্শী এমন নহে। যে শিক্ষক যে বিদ্যায় পারদর্শী তদ্বিদ্যালাভেচ্ছু ছাত্র সেই শিক্ষকের নিকটই সেই বিদ্যা শিক্ষা করে। তাহাতে দোষ কি? লোকসমূহ শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানায় কেবল কুসংস্কারে আবদ্ধ; এইজন্যই ধর্ম্ম নষ্ট হইল। অনুষ্ঠান আছে, উদ্দেশ্য নাই। জ্ঞানলাভের জন্যই গুরুকরণ আবশ্যক, বার্ষিক টাকা দিবার জন্য নহে। আজকাল গুরু-গিরি কোন কোন স্থলে অর্থকরী ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। বৎস! বিত্তগ্রাহী গুরু অনেক আছেন কিন্তু সন্তাপহারী গুরু অতি দুর্লভ। *

শিষ্য। আচ্ছা, গুরুদেব! মন্ত্রচৈতন্য বা শক্তিসঞ্চার হইলে গাত্র-কম্পাদি উপস্থিত হয় কেন?

গুরু। হে পুত্র! তুমি সাধু প্রশ্ন করিয়াছ। এই প্রশ্নের উত্তর আমি আগামী দিনের বিবৃতিতে তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া দিব; এখন তজ্জন্য ভাবিও না।

* "গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥"

[গুরুগীতা]

তৃতীয় বিবৃতি

শিষ্য। ভগবন্! মন্ত্র কি, মন্ত্রচৈতন্যের আবশ্যকতা কি, বা কুণ্ডলিনী শক্তিই বা কি, তাহা আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। আপনার উপদেশামৃত পান করিয়া আমার জ্ঞানপিপাসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

গুরু। হে পুত্র! তুমি বেশ প্রশ্ন করিয়াছ, ধীরে ধীরে তোমার প্রশ্নের সমাধান করিতেছি। মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিও, এবং যেখানে বুঝিতে না পারিবে সেখানে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া তোমার সংশয় নিরসন করিয়া লইও। এখন মন্ত্র কি তাহা শুন।

"মননাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

অর্থ। যেহেতু মনন হইতে ত্রাণ করে সেই হেতুই 'মন্ত্র' কহা যায়, অর্থাৎ যাহা দ্বারা মনন হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহাই 'মন্ত্র'।

মনন অর্থাৎ চিন্তা; চিন্তা মনেরই ধর্ম্ম। মনোলয়ে চিন্তারাশির ত্যাগ হয়। চিন্তারাশির ত্যাগ হইলেই নিশ্চিন্ততারূপ যোগলাভ হয়।

প্রাণই মনের ত্রাণকর্ত্তা, কেননা প্রাণস্পন্দনই মন। প্রাণস্পন্দ রহিত হইলেই মনের ত্রাণ হয় অর্থাৎ মন সর্ব্ববিষয়চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আত্মতত্ত্বে লীন হয়। যখন প্রাণ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সহস্রারস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হইবে, তখন মনও লয়-প্রাপ্ত হইবে। ইড়া তমোগুণবিশিষ্টা, পিঙ্গলা রজোগুণবিশিষ্টা এবং সুষুম্না সত্ত্বগুণবিশিষ্টা। প্রাণ ইড়া ও পিঙ্গলাতে থাকার জন্যই মন বা চিত্ত রজঃ ও তমোঽভিভূত হইয়া চঞ্চল হয় এবং বিষয়ভোগের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রাণ যখন গুরুকৃপায় সুষুম্নামার্গে প্রবাহিত হয় তখন

সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হওয়াতে আত্মতত্ত্বের প্রতি মনের একাগ্রতা ও সবিকল্প আনন্দ লাভ হয় এবং তৎপরে ব্রহ্মরন্ধ্রে লয়প্রাপ্ত হইলে মনের নিরুদ্ধতা বা নির্ব্বিকল্পতা জন্মে। তবেই দেখ, প্রাণই মন্ত্র।

"ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনম্।
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে॥"

অর্থ। [উমাপতি উমাকে বলিয়াছেন] হে প্রিয়ে! ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত প্রাণিগণের প্রাণবর্দ্ধনকারী উচ্ছ্বাস ও নিঃশ্বাসই এই মন্ত্র।

যোগচূড়ামণি উপনিষদে আছে,—

"হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংস হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদা সদা॥"

অর্থ। হংকারপূর্ব্বক প্রাণবায়ু বাহির হইতেছে এবং সকারপূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। জীব সর্ব্বদাই এই 'হংস' মন্ত্র এরূপ ভাবে দিবারাত্রি একুশ হাজার ছয় শত বার জপ করিতেছে। এই অজপা-নামক গায়ত্রী যোগিগণের মোক্ষদায়িনী।

প্রাণশক্তিস্বরূপা মূলাধারস্থা কুণ্ডলিনী হইতেই এই মন্ত্রের উৎপত্তি।

"কুণ্ডলিন্যাং সমুদ্ভূতা গায়ত্রী প্রাণধারিণী।
প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা যস্তাং বেত্তি স বেদবিৎ॥"

[যোগচূড়ামন্যুপনিষৎ]

অর্থ। কুণ্ডলিনীই প্রাণশক্তিময়ী গায়ত্রীর উৎপত্তিস্থল; এই গায়ত্রীই প্রাণবিদ্যারূপা মহাবিদ্যা; যিনি এই বিদ্যা জানেন তিনিই বেদবিৎ।

কুণ্ডলিনী শক্তিই জীবের জীবনী শক্তি বা প্রাণশক্তি; * এই শক্তি হইতেই অকার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত সকল বর্ণের, সুতরাং বর্ণময়ী মন্ত্রশক্তিসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যোগশিখোপনিষদে আছে,—

"মূলাধারগতা শক্তিঃ স্বাধারা বিন্দুরূপিণী।
তস্যামুৎপদ্যতে নাদঃ সূক্ষ্মবীজাদিবাঙ্কুরঃ।
তাং পশ্যন্তীং বিদুর্বিশ্বং যয়া পশ্যন্তি যোগিনঃ॥
হৃদয়ে ব্যজ্যতে ঘোষো গর্জ্জৎপর্জ্জন্যসন্নিভঃ।
তত্র স্থিতা সুরেশান মধ্যমেত্যভিধীয়তে॥
প্রাণেন চ স্বরাখ্যেন প্রথিতা বৈখরী পুনঃ।
শাখা-পল্লবরূপেণ তাল্বাদিস্থান-ঘট্টনাৎ॥
অকারাদিক্ষকারান্তান্যক্ষরাণি সমীরয়েৎ।
অক্ষরেভ্যঃ পদানি স্যুঃ পদেভ্যো বাক্যসম্ভবঃ॥
সর্ব্বে বাক্যাত্মকা মন্ত্রা বেদশাস্ত্রাণি কৃৎস্নশঃ।
পুরাণানি চ কাব্যানি ভাষাশ্চ বিবিধা অপি॥
সপ্তস্বরাশ্চ গাথাশ্চ সর্ব্বে নাদসমুদ্ভবাঃ।
এষা সরস্বতী দেবী সর্ব্বভূতগুহাশ্রয়া॥"

অর্থ। মূলাধারগতা কুণ্ডলিনীশক্তি বিন্দুরূপিণী, ইনিই স্ব অর্থাৎ আত্মার আধারভূতা (জীবাত্মা ইহাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছেন)। সূক্ষ্মবীজ হইতে অঙ্কুরের ন্যায় এই কুণ্ডলিনীরূপা সূক্ষ্মপ্রাণশক্তি হইতেই নাদের উৎপত্তি হয়। যোগিগণ এতদ্দ্বারা (নাদের এই অঙ্কুরাবস্থাদ্বারা)ই নাদের বিশ্ব অবস্থা দর্শন করিয়া থাকেন, এইজন্য নাদের এই অবস্থাকে 'পশ্যন্তী' বলা যায়। তৎপরে

* "সা দেবী বায়বী শক্তিঃ।" [রুদ্রযামল]; অর্থাৎ সেই দেবী (কুণ্ডলিনী)ই বায়বী শক্তি (অর্থাৎ প্রাণশক্তি)।

নাদ হৃদয়দেশে উপস্থিত হইলে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গুর্ গুর্ ধ্বনি প্রকাশ পায়। হে সুরেশ্বর ব্রহ্মন্! নাদের এই হৃদয়স্থ অবস্থাকে 'মধ্যমা' বলা হয়। তাহার পর ঐ নাদ যখন প্রাণবায়ুযোগে (কণ্ঠ হইতে) 'স্বর' (আওয়াজ বা শব্দ) নাম ধরিয়া বহির্গত হয়, তখন তাহাকে 'বৈখরী' (প্রখর বা সুস্পষ্ট শব্দ) বলা হয়। এই বৈখরী শব্দই কণ্ঠ-তালু-মূর্দ্ধাদি স্থানসমূহকে আঘাত করিয়া, শাখাপল্লবরূপে অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত অক্ষররূপে অভিব্যক্ত হয়। অক্ষরসমূহের সমবায় হইতে পদ এবং পদসমূহের সমবায়ে বাক্য প্রকাশিত হয়। সকল মন্ত্র, সমগ্র বেদ-শাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্যসমূহ এবং বিবিধ ভাষা, সপ্তস্বরসমন্বিত গীতসমূহ, এই সকলই নাদ হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এই সরস্বতী (বাক্) দেবী মূলতঃ সর্ব্বভূতের মূলাধাররূপ গুহাকে আশ্রয় করিয়াই আছেন।

হে বৎস! যেমন আত্মার জাগ্রত (স্থূল), স্বপ্ন (সূক্ষ্ম), সুষুপ্তি (কারণ)ও তুরীয় এই চারিটী অবস্থা, তদ্রূপ নাদেরও চতুর্ব্বিধ অবস্থা আছে স্মরণ রাখিও—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মূলাধারস্থা বিন্দুরূপিনী পরাশক্তি কুণ্ডলিনীই 'পরা' নামে আখ্যাত; এই পরাটীই নাদের তুরীয়াবস্থা। তৎপরে ঐ নাদ স্বাধিষ্ঠানে উপস্থিত হইলে যে অবস্থা হয় তাহারই নাম 'পশ্যন্তী'। এই পশ্যন্তী নাদের সুষুপ্তি বা কারণাবস্থা। ঐ নাদ হৃদয়ে উপস্থিত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাকে 'মধ্যমা' এবং সর্ব্বশেষে যখন কণ্ঠ হইতে স্পষ্টশব্দরূপে উচ্চারিত হয় তখন তাহাকে 'বৈখরী' বলা হয়। 'মধ্যমা' অবস্থাপন্ন নাদকে অনাহত ধ্বনি বলা হয়, যেহেতু হৃদয়দেশে বিনা আঘাতে স্বতঃই ঐ ধ্বনি প্রকাশ পায়। এই 'মধ্যমা' নাদের সূক্ষ্ম বা স্বপ্নাবস্থা এবং 'বৈখরী' নাদের জাগ্রত বা স্থূলাবস্থা। নাদের পরা ও পশ্যন্তী অবস্থাদ্বয় যোগ-সিদ্ধগণের অনুভূতিগম্য এবং মধ্যমা অবস্থাটী যোগপথে অগ্রসর সাধক-

দিগের দ্বারা অনুভূত হয়, আর বৈখরী অবস্থাটী সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যক্ত হয়।

হে বৎস! কেহ কেহ যোনিমুদ্রা বা ভ্রামরীকুম্ভক অভ্যাসদ্বারা এই মধ্যমা নাদটী শ্রবণ করিয়া থাকেন।

হে বৎস! এখন বুঝিলে ত, কুণ্ডলিনীশক্তিই সকল মন্ত্রের প্রাণ-স্বরূপা। কুণ্ডলিনীর জাগরণই মন্ত্রচৈতন্য। মন্ত্রচৈতন্য না হইলে কোন মন্ত্রাদিদ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় না।

"মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো।
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ।
তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্॥"

[গৌতমীয়তন্ত্রম্]

অর্থ। হে প্রভো! যে পর্য্যন্ত মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিতা থাকে, সে পর্য্যন্ত মন্ত্র, যন্ত্র ও অর্চ্চনাদি কিছুই সফল হয় না, যদি বহু-পুণ্যসঞ্চয়হেতু কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হন, তবেই তাঁহার কৃপায় মন্ত্র, যন্ত্র ও অর্চ্চনাদি সফল হইয়া থাকে।

এই দেহে প্রাণ না থাকিলে যেমন দেহ কার্য্যক্ষম হয় না, তদ্রূপ মন্ত্রের প্রাণশক্তি উদ্বোধিত না হইলে, শত শত পুরশ্চরণ করিলেও সেই মন্ত্রদ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। *

"বিনা প্রাণং যথা দেহঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
বিনা প্রাণং তথা মন্ত্রঃ পুরশ্চর্য্যা শতৈরপি॥"

মন্ত্রার্থ এবং মন্ত্রচৈতন্য না জানিয়া যে সাধক জপাদি করে, শতলক্ষ জপাদি করিলেও, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। *

এইজন্যই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। আর্য্যঋষিরা চৈতন্যেরই উপাসক ছিলেন, জড়ের নহে। আমাদের মূর্ত্তিপূজায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন পূজা সিদ্ধ হয় না। অনেকস্থলে পূজক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে জানে না বলিয়াই মূর্ত্তিপূজা করিয়া কোন ফললাভ করিতে পারে না; পরে দেবতার উপর দোষারোপ করে। এই কারণেই আজকালকার শিক্ষিত সমাজ মূর্ত্তিপূজার ঘোর বিরোধী। হে বৎস! পূজক যদি শক্তিশালী যোগী ও ভাবুক হন, তবেই তিনি প্রতিমাতে প্রাণ বা শক্তি সঞ্চার করিতে সমর্থ হন, এবং তাহা হইলেই মৃণ্ময়মূর্ত্তিতেও চিন্ময়মূর্ত্তি ভাসিতে থাকে ও পরে তাহা হইতেই সাধকের ইষ্ট নামরূপরহিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ প্রকাশিত হন।

যত কিছু মূর্ত্তি আছে, সকলই বস্তুতঃ প্রাণময়,—এ সকলই প্রাণেরই রূপ।

"প্রাণোঽপি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ॥"

অর্থ। প্রাণই ভগবান্ মহেশ্বর, প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই ব্রহ্মা, প্রাণ দ্বারাই ভূর্ভুবাদি লোকসমূহ ধৃত হইয়া আছে; সর্ব্বজগৎই প্রাণময়।

ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মন্ত্রসমূহ প্রাণশক্তিরই অভিব্যক্তি এবং মন্ত্রের এই প্রাণশক্তি উদ্বোধিত না হইলে মন্ত্রদ্বারা কোন সিদ্ধিই লাভ হয় না। একটী গল্প বলিতেছি, শুন—

---

* মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষং প্রজপ্তোঽপি তস্য মন্ত্রো ন সিধ্যতি॥
[মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্]

একদা এক ব্রাহ্মণ যথেচ্ছভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার শক্তিলাভ-কামনায় তপোরত ব্যাসদেবের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত ও প্রণত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ব্রাহ্মণের বিনয়নম্রব্যবহারে ব্যাসদেব সন্তুষ্ট হইয়া একটী বিল্বপত্রে 'ওঁ রাম' এই মন্ত্র লিখিয়া, পাতাটী মুড়িয়া ব্রাহ্মণের হাতে দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, পাতাটী কাপড়ে বাঁধিয়া তিনি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন সেইখানেই যাইতে পারিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ সেই মন্ত্র-শক্তিবলে তাঁহার ইচ্ছামত অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, বায়ু, বরুণ ও সূর্য্যলোকাদি সকল লোকেই যাতায়াত করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে এক সময় ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, "এই বিল্বপত্রে কি লেখা রহিয়াছে দেখি না কেন, যাহার গুণে আমি স্বর্গাদি সকল লোকে বিচরণ করিতে পারিতেছি।" অমনি ব্রাহ্মণ বস্ত্রাঞ্চল হইতে বিল্বপত্রটী খুলিয়া মন্ত্রটী দেখিবামাত্র অট্টহাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও রাম! এই মন্ত্রটী ত আমিও জানি, ইহারই এত শক্তি! তাহা ত এতদিন জানিতাম না। যাহা হউক, এই পত্রটী ত শুষ্ক ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন আর ভাবনা কি? এইটী ফেলিয়া দিয়া, আর একটী নূতন বিল্বপত্রে মন্ত্রটী লিখিয়া লইলেই ত চলে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ঐ জীর্ণ পত্রটী গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া, একটী নূতন বিল্বপত্র লইয়া তাহাতে 'ওঁ রাম' লিখিয়া বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন। কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দুঃখিত মনে পুনরায় ব্যাসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বকৃতকর্ম্মের কথা প্রকাশপূর্ব্বক আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সখেদ উক্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি বলিলেন, "রে মূর্খ! যে সাধনশক্তির বলে আমি মনুষ্য হইয়াও দেবত্ব লাভ করিয়াছি, সেই শক্তিদ্বারা এই মন্ত্রকে শক্তিমান্ করিয়া

দিয়াছিলাম ; সেই শক্তিতেই তুমি যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারিয়াছ ; তোমার নিন্দিত মন্ত্রদ্বারা কি সেই কাজ হইতে পারে ? যাও, আমাদ্বারা আর কিছু হইবে না।" তখন ব্রাহ্মণ দুঃখিত মনে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

শিষ্য। মন্ত্রচৈতন্য কি, তাহা বুঝিলাম ; এখন মন্ত্রার্থ কি তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। মন্ত্রপ্রতিপাদিত দেবতাই মন্ত্রার্থ। মন্ত্র বাচক এবং তৎ-প্রতিপাদ্য দেবতাই তাহার বাচ্য। দেখ বৎস! বাচকের সহিত বাচ্যের সম্বন্ধ নিত্যই আছে। যেমন 'সূর্য্য' এই বাচক শব্দের সহিত সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজের নিত্যই সম্বন্ধ আছে, 'সূর্য্য'শব্দদ্বারা কেবল ঐ সম্বন্ধের প্রকাশ হয় মাত্র, তদ্রূপ মন্ত্রের সহিত তৎপ্রতিপাদিত দেবতার সম্বন্ধ সর্ব্বদাই আছে, মন্ত্রদ্বারা কেবল ঐ সম্বন্ধেরই প্রকাশ হয় মাত্র। কাজেই কোন্ দেবতার কোন্ মন্ত্র তাহা গুরুর নিকট হইতে জানিয়া জপ করা বিধেয়। মন্ত্রজপ এবং তৎপ্রতিপাদিত দেবতার চিন্তাদ্বারা মনের একাগ্রতা লাভ, এবং তৎপরে স্বীয় আত্মাতেই সেই দেবতার দর্শন বা প্রকাশ হয়। যোগসূত্রের ভাষ্যকার ব্যাসদেব স্বীয় ভাষ্যে কহিয়াছেন,—

"প্রণবস্য জপঃ প্রণবাভিধেয়স্য চ ঈশ্বরস্য ভাবনা। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্তং একাগ্রং সম্পদ্যতে।"

অর্থ। প্রণবের জপ এবং প্রণবের অভিধেয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য চৈতন্যরূপী ঈশ্বরের ভাবনা। এইরূপে প্রণবজপ এবং তদর্থ ভাবনাকারী যোগীর চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে।

এখানে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্রকেই প্রণব বলিয়া মনে করিও।

"প্রাণান্ সর্ব্বান্ পরমাত্মনি প্রণাময়তীত্যেতস্মাৎ প্রণবঃ।"

[অথর্ব্বশিখোপনিষৎ]

অর্থ। যদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রাণবৃত্তি পরমাত্মাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহাই প্রণব।

শিষ্য। পিতঃ! আপনি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, কুণ্ডলিনীশক্তিই জীবনী শক্তি বা প্রাণশক্তি। যদি তাহাই হয়, তবে জাগ্রত বস্তুর আবার জাগরণ কি? কেননা প্রাণশক্তি ত জাগিয়াই আছে। তাহা না হইলে বস্তুর জ্ঞান হয় কি প্রকারে, এবং আমরা বাঁচিয়াই বা আছি কি প্রকারে?

গুরু। বৎস! তুমি বেশ প্রশ্ন করিয়াছ! সাবধানচিত্তে শ্রবণ কর। অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে কুণ্ডলিনীশক্তির দুই মুখ, যেন দুমুখী সাপ।

"দ্বিবক্ত্রা কুণ্ডলিন্যভিধা নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা কলা প্রকৃতির্বর্ত্ততে।"

অর্থ। কুণ্ডলিনী নাম্নী নিত্যানন্দস্বরূপা পরমা প্রকৃতি বর্ত্তমান আছেন, ইঁহার দুই মুখ।

দ্বিমুখবিশিষ্টা সার্দ্ধত্রিবলয়াকৃতি কুণ্ডলিনী একমুখ ব্রহ্মবিবরে (সুষুম্না রন্ধ্রে) রাখিয়া ব্রহ্মদ্বার রোধপূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন; অন্যমুখ দণ্ডাহতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, এই মুখদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস হইতেছে; ইহা জীবের নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস। এই মুখে তিনি সর্ব্বদা জাগ্রতা, তাই জীবের বহিশ্চেতন বা বাহ্যজ্ঞান বেশই আছে; এই জন্যই জীবের ভিন্ন ভিন্ন বোধ, একত্ব বোধ নাই। অন্তর্মুখ সুপ্ত বা বদ্ধ থাকাতেই জীবের অন্তর্জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব। যে পথদ্বারা গমন করিলে সহস্রারে নিরাময় ব্রহ্মস্থানে যাইয়া সাধক ব্রহ্ম বা আত্ম সাক্ষাৎকার করেন, সুষুম্নাস্থিত সেই ব্রহ্মদ্বারকে নিরোধ করিয়া পরমেশ্বরী নিদ্রা যাইতেছেন। *

---

* "যেন মার্গেণ গন্তব্যং ব্রহ্মস্থানং নিরাময়ম্।
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী॥"
[হঠযোগপ্রদীপিকা]

যাবৎ এই মুখে (সুষুম্নামার্গে) প্রাণশক্তি প্রবাহিতা না হয় তাবৎ মোক্ষ অসম্ভব। যোগশিখোপনিষদে আছে—"নাকৃতং মোক্ষমার্গঃ স্যাৎ প্রসিদ্ধং পশ্চিমং বিনা।" (পশ্চিম অর্থাৎ পশ্চাৎ ভাগের পথকে প্রসিদ্ধ বা খোলসা করিয়া না লইলে মোক্ষমার্গে গতি হয় না)। সুষুম্নাই পশ্চিম পথ এবং আমাদের সম্মুখভাগস্থ গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও নাসিকা দ্বারা যে প্রাণ প্রবাহিত হয়, সেই পথই পূর্ব্ব পথ। এই পূর্ব্ব মুখই প্রাণগতির বহির্মুখ। এই মুখেই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া হইতেছে। অন্তর্মুখটী মূলাধারে কবাটের ন্যায় বদ্ধ আছে। এই মুখ খুলিয়া দেওয়াকেই কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ কহে।

হে বৎস! মূলাধারে সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকৃতি একটী নাড়ী আছে। উহারই মধ্যে প্রাণশক্তি অবস্থান করিতেছেন; এই নিমিত্ত ইনি কুণ্ডলিনী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। * এই শক্তি নবীনতড়িন্মালা-সদৃশী অর্থাৎ মেঘমধ্যগত-বিদ্যুন্মালার ন্যায় বিরাজমানা। বৎস! বৈদ্যুতিক আলো দেখিয়াছ ত? একটী তারের ভিতর দিয়া এই আলো প্রকাশিত হয়, তাই তারের আকারের ন্যায়ই আলোটী দৃশ্যমান হয়। বাস্তবিক উহা আলোর আকার নহে, আলো তাররূপ আধারে প্রকাশিত হওয়াতেই তদাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্রূপ প্রাণশক্তি উক্ত সর্পবৎ কুণ্ডলীভূতা নাড়ীতে প্রবিষ্ট থাকাতেই তাহাকে 'কুণ্ডলিনী' বা কুণ্ডলাকৃতি বলা হয়। এখন বুঝিলে ত? প্রাণশক্তিই কুণ্ডলিনী শক্তি। কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণের অর্থ—গুরুশক্তিপ্রভাবে প্রাণ-শক্তিকে সুষুম্নাপথে ঊর্দ্ধমুখে প্রবাহিত করা।

* "মূলাধারে সর্পবৎ কুণ্ডলীভূতা নাড়ী বর্ত্ততে, তন্মধ্যে স্থায়িত্বাদ্ ইয়ং কুণ্ডলী।"

[সারদাতিলক-টীকা]

শিষ্য। আচ্ছা, গুরুদেব! কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইলে, তখনই একদমে সহস্রারে যাইয়া সমাধি ঘটায় না কেন?

গুরু। দেখ বৎস! কৃষক যেমন এক ক্ষেত্র হইতে সমতল অথবা নিম্নতর ক্ষেত্রান্তরে জল আনিতে ইচ্ছুক হইলে, হস্তদ্বারা জলসেচন না করিয়া, শেষোক্ত ক্ষেত্রে জল যাইবার প্রতিবন্ধক কর্ত্তন করিয়া দেয় মাত্র, এবং প্রতিবন্ধক কর্ত্তন করিয়া দিলে আপনা হইতেই জল প্রবাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত ক্ষেত্রকে প্লাবিত করে, তদ্রূপ মূলাধারস্থিতা প্রাণশক্তিস্বরূপিনী কুলকুণ্ডলিনীশক্তি গুরুশক্তিপ্রভাবে জাগরিতা হইলেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে অকূলে অর্থাৎ সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিতা হইবার জন্য গমন করিতে থাকেন। এই শক্তির সেই ব্রহ্ম-স্থানে গমনের একমাত্র সরলপথই সুষুম্না নাড়ী। সহস্রারই আমাদের যাবতীয় শক্তির কেন্দ্রস্থল; সর্ব্বপ্রকার শক্তিই সহস্রার হইতে সুষুম্নাকে আশ্রয় করিয়া নিম্নাভিমুখে প্রবাহিতা হইয়াছে। এই শক্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শক্তিই কুণ্ডলিনী। তিনিই মূলশক্তি—আদ্যাশক্তি। এইজন্য তৎস্থানকে মূলাধার কহে। এই শক্তি গুরুকৃপায় পুনরায় ঊর্দ্ধমুখে প্রবাহিতা হইলে, তাহা বিলোমক্রমে সুষুম্নাপথেই প্রবাহিতা হইয়া সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিতা হইবে। ইহাই শাক্তমতে শিব-শক্তির মিলন; বৈষ্ণবেরা ইহাকেই রাধাকৃষ্ণের মিলন কহেন। মূল-শক্তি চক্র হইতে চক্রান্তরক্রমে উঠিবার কালে, পথিমধ্যে যে যে স্থানে যে যে শক্তি আছেন, সেই সকল শক্তিই তাঁহার অঙ্গে লয় পাইতে থাকে।

দেখ বৎস! যেমন তামাক খাইবার হুকার নাল (নলিচা)টী লৌহ-শলাকাদ্বারা পরিষ্কার না করিলে, তাহাতে ময়লা পড়িতে পড়িতে কয়েকদিন পরে উহা বদ্ধ হইয়া যায়, এবং তদ্দ্বারা আর তামাকের ধূম

আকর্ষণ করা চলে না, কিন্তু অগ্নিদগ্ধ-লৌহশলাকাদ্বারা আস্তে আস্তে নাল পরিষ্কার করিতে করিতে উহা যখন বেশ পরিষ্কৃত হইয়া যায়, তখন অবাধগতিতে ধূম নালদ্বারা প্রবেশপূর্ব্বক তাম্রকূটসেবীর মনকে প্রফুল্ল করে; তদ্রূপ সুষুম্নাপথ বহুজন্মজন্মান্তরীন বাসনা ও সংস্কার-রাশিরূপ ক্লেদদ্বারা অপরিষ্কৃত হইয়া থাকায়, কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হওয়ামাত্রই সাধকের সমাধি হইতে পারে না। কারণ যখনই শক্তি ঊর্দ্ধগামী হইতে চায়, তখন ক্লেদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় মূলাধারে বায়ুরোধ হয় এবং তজ্জন্য শক্তির স্পন্দন হইতে থাকাতে গাত্রকম্প ও শরীরের নৃত্যাদি অর্থাৎ নানারূপ অঙ্গসঞ্চালনাদি হইতে থাকে। যোগ-শিখোপনিষদে আছে,—

"আধারবাতরোধেন শরীরং কম্পতে যদা।
আধারবাতরোধেন যোগী নৃত্যতি সর্ব্বদা॥"

অর্থ—[ঊর্দ্ধগমনসময়ে] মূলাধারস্থ প্রাণবায়ু বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শরীর কম্পিত হয়, এবং সেইজন্য যোগীর নর্ত্তনাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

এইরূপ কম্প ও নৃত্যাদি অর্থাৎ ঘূর্ণা, আসন, মুদ্রা, এবং শরীরের নানাপ্রকার দোলাদিদ্বারা সুষুম্না নাড়ীর ক্লেদগুলি দূরীভূত হইতে থাকে, এবং সুষুম্নাকে পরিষ্কার করার জন্য নানাপ্রকার কুম্ভকাদিও হইতে থাকে। এই সকল ক্রিয়াদ্বারা সুষুম্নাপথ পরিষ্কৃত হইলে পর শক্তি অবাধগতি প্রাপ্ত হওয়ায় সহস্রারে যাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হয় এবং তখন সাধকের সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়। যাঁহার সুষুম্না নাড়ী, পূর্ব্বসুকৃতিবশতঃ, প্রথম হইতেই পরিষ্কৃত থাকে, তাঁহার শক্তিজাগরণ হওয়ামাত্রই সমাধি হইতে পারে বৈ কি।

বৎস! সর্ব্বমন্ত্রের প্রাণ কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হওয়ামাত্র কেন

সমাধি হয় না, এবং সমাধি আসিবার পূর্ব্বে কেন নানারূপ অঙ্গসঞ্চালন ও কম্পাদি হয়, তাহা এখন বুঝিলে ত ?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুঝিয়াছি। এখন রাধাকৃষ্ণের মিলন এবং শিবশক্তির মিলন কিরূপ, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। হে পুত্র! তুমি বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমাকে ইহার যৌগিকভাব ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণ সহস্রদলপদ্মে আছেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ।

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

অর্থ। অনাদিবস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বরস্বরূপ। তিনি লীলার্থ সর্ব্বপ্রথম যে পুরুষাকারে প্রকাশিত হন, তাঁহাকেই আদি কহে, তিনিই পৃথিবীর রক্ষক এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

৺ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অভিন্না শক্তি রাধা (চিৎশক্তি)। এই চিৎশক্তিস্বরূপিনী রাধা যখন চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণে অভিন্নভাবে ছিল, তখন কোন লীলাই ছিল না। লীলারস ভোগ করিবার জন্যই ৺ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অঙ্গ হইতে চিৎশক্তি রাধার প্রকাশ করেন। এই রাধাই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি। সুতরাং রাধাই চিৎশক্তি বা কুণ্ডলিনীশক্তি। আনন্দদান করেন বলিয়াই তিনি হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তি না জাগিলে সাধককে আনন্দদান করিবে কে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

"একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

*　　*　　*

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥

*　　　*　　　*

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণ কান্তশিরোমণি॥
কিংবা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরিমাণ॥”

বৎস! সহস্রার হইতে যে ধারা (শক্তি) নিম্নাভিমুখে প্রবাহিতা হইয়াছে, তাহাকে বিলোমক্রমে ঊর্দ্ধাভিমুখী করিলে ‘ধারা’ই ‘রাধা’-রূপে সহস্রারে পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া সাধককে পরমানন্দের অধিকারী করে। ‘ধারা’কে উল্টাও, ‘রাধা’ হইবে; যথা—ধা+রা=রা+ধা।

হে পুত্র! যেমন আকাশ হইতে পতিত জল নদী ও নালাদ্বারা প্রবাহিত হইয়া সাগরে মিলিত হয় ও স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগরে বেমালুম মিশিয়া যায়, তদ্রূপ এই শক্তিও পরমাত্মায় মিলিত ও একীভূত হইয়া স্বীয় নামরূপ পরিত্যাগ করে। নাম ও রূপই লীলা। যতক্ষণ নাম ও রূপ, ততক্ষণই জপ, তপ, পূজা ও অর্চ্চনা ইত্যাদি। শক্তিরই নামও রূপ। সুতরাং শক্তিসাধনা ভিন্ন কেহ

কখনও সেই নাম ও রূপের অতীত নির্গুণ চৈতন্যকে লাভ করিতে পারে না। নির্গুণ চৈতন্যের উপরই সগুণ নাম ও রূপ ভাসিতেছে, যেমন জলের উপরেই তরঙ্গ খেলে। গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াদ্বারা এই শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হইলেই নির্গুণ সচ্চিদানন্দস্বরূপের উপলব্ধি হয়। তখন সাধ্যসাধক এক হইয়া যায়। সাধকের নিজ সত্তা ভগবৎসত্তায় মিশিয়া যাওয়াই মহাভাব। রাসলীলাকালে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণভাবে বিভোর হইয়া সর্ব্ববস্তুতেই প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে মহাভাবে বিভোর হন, এবং নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া 'আমিই কৃষ্ণ' এইরূপ অনুভব করিতে থাকেন।

হে বৎস! এখন শিবশক্তির মিলনটী তোমাকে, মা দশভুজা দুর্গামূর্ত্তিদ্বারা বুঝাইতেছি। মা কুলকুণ্ডলিনীশক্তিই দশভুজা। দশ দিকেই আমার মা'র লীলার বিকাশ, অথবা দশ দিকেই তিনি ব্যাপিয়া আছেন, তাই আমার মা'র দশটী হাত। বেদান্তজ্ঞান-সিংহই মা'র বাহন, তাই তিনি সিংহবাহিনী। যোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে পর, জ্ঞানদ্বারাই আমার মা'র নির্গুণ চৈতন্যস্বরূপ জানা যায়। আমার মা'ই বিদ্যা, বল, সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের আধারস্বরূপা; তাই মাতার দুই পুত্র—সিদ্ধিদাতা গণেশ ও বলরূপী কার্ত্তিক, এবং দুই কন্যা—বিদ্যারূপিণী সরস্বতী ও ঐশ্বর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী। যে সাধক ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানদ্বারা এই চৈতন্যস্বরূপিণী মাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার বিদ্যা, বল, সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই, কারণ মা'র পুত্র ও কন্যাগণ নিত্যই তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করেন—যেখানে মা সেখানেই কার্ত্তিক, গণেশ ও লক্ষ্মী, সরস্বতী। শ্রীশ্রীমা'র পূজাও বসন্ত আর শরৎকালেই হইয়া থাকে। যোগেরও শ্রেষ্ঠ সময় এই দুইটী। বৎস! মাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে চাও ত কুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধন কর।

প্রথমেই বোধন, তৎপরে সপ্তমীপূজা; অর্থাৎ প্রথমতঃ মূলাধারে কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ, তৎপরে দশদল-নাভিপদ্মে ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ। সপ্তমীপূজার পর অষ্টমীপূজা, কি না দ্বাদশদল-হৃদয়পদ্মস্থিত বিষ্ণুগ্রন্থির ভেদ। ইহার পর নবমীপূজাদ্বারা ভ্রূমধ্যে দ্বিদলচক্রে অবস্থিত রুদ্র-গ্রন্থির ভেদ। বৎস! এই পর্য্যন্তই সগুণরূপদর্শন। নাম ও রূপই সগুণ। দশমী তিথিতে নাম ও রূপের বিসর্জ্জন, অর্থাৎ গুরুকৃপায় কুণ্ডলিনীশক্তি ষট্চক্র ও গ্রন্থিত্রয় ভেদ করিয়া সহস্রারে ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হইলে, পরে সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ সমাধিদ্বারা মা'র নিগু'ণ চৈতন্যস্বরূপের উপলব্ধি। এখানেই আত্মায় আত্মায় (জীবাত্মায় ও পরমাত্মায়) মিলিয়া যাওয়া,—এখানেই একত্বের অনুভব। সাধক সমাধিভঙ্গের পরও "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" (অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মময়) অনুভব করেন এবং তখন আত্মভাবে সকলকেই প্রেমে আলিঙ্গন করিতে থাকেন। এখানেই যোগীর যোগসাধনা শেষ। যোগী তখন সদা আত্মভাবে স্থিতিলাভ করেন। এইরূপ স্থিতিকেই ব্রাহ্মী স্থিতি কহে। ইহাই সাধনার পরাবস্থা এবং এই অবস্থায়ই সর্ব্বপ্রকার কামনার নিবৃত্তি হয়। যোগ-কুণ্ডলী উপনিষদে আছে,—

"জ্বলনাঘাত-পবনাঘাতোরুন্নিদ্রিতোঽহিরাট্।
ব্রহ্মগ্রন্থিং ততো ভিত্বা বিষ্ণুগ্রন্থিং ভিনত্ত্যতঃ॥
রুদ্রগ্রন্থিং চ ভিত্ত্বৈব কমলানি ভিনত্তি ষট্।
সহস্রকমলে শক্তিঃ শিবেন সহ মোদতে॥
সৈবাবস্থা পরা জ্ঞেয়া সৈব নিবৃত্তিকারিণী॥"

অর্থ। অভ্যন্তরস্থ অগ্নিদ্বারা তাপিত প্রাণবায়ুকর্ত্তৃক সর্পাকৃতি কুল-কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন; তখন সেই শক্তি ক্রমান্বয়ে ষট্পদ্ম এবং ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া সহস্রারস্থ পরমশিবের সহিত

মিলিত হইয়া আনন্দরস ভোগ করেন; ইহাকেই সাধনার পরাবস্থা বলিয়া জানিবে; এই অবস্থায় সকল কামনার নিবৃত্তি হয়।

এই অবস্থায় যে আনন্দলাভ হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, কেবল স্বানুভূতিগম্য। বৎস! এইজন্যই দশমীর পর অর্থাৎ মূর্ত্তিবিসর্জ্জনের পর আলিঙ্গনের প্রথা আমাদের দেশে আছে। যতক্ষণ শক্তি অকুল অর্থাৎ সহস্রারস্থ শিব হইতে পৃথক্ হইয়া আজ্ঞাচক্র হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত অবস্থান ও বিচরণ করেন, ততক্ষণই উপাসনা। সগুণেরই উপাসনা হয়, নিগুর্ণের উপাসনা নাই। সগুণই দ্বৈত, নিগুর্ণই অদ্বৈত। দুই বোধ আছে বলিয়াই ত উপাসনা। উপাসনাদ্বারা যখন উপাসক স্বীয় আত্মাকেই উপাস্যরূপে দর্শন করেন, তখন কে কাহার উপাসনা করিবে? কাজেই তখন উপাসনাও থাকে না। বৎস! মনে রাখিও, দেহমধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রই নিগুর্ণ ব্রহ্মের এবং ভ্রূমধ্যই সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি-স্থান; ভ্রূমধ্য অর্থাৎ দ্বিদল পর্য্যন্তই যত রূপের দর্শন, কিন্তু সহস্রারে কেবল 'অরূপের রূপ' অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-সাক্ষাৎকার।

শিষ্য। পিতঃ! আপনার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনের অনেক সংশয় দূরীভূত হইল এবং বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। পূর্ব্বে এমন তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কথা আর কখনও শুনি নাই। কালীমূর্ত্তিতে কি যৌগিক বা আধ্যাত্মিক ভাব আছে, শুনিতে ইচ্ছা হয়। আপনার উপদেশ শুনিয়া মনে ক্রমশঃই তত্ত্ব জানিবার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

গুরু। বৎস! মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তিই আমার মা কালী। ইনিই আদ্যাশক্তি এবং শিব-স্বরূপিণী, কারণ শক্তি ও শক্তিমান্ বস্তুতঃ অভিন্ন। দেবীগীতায় আছে,—

"তদূর্দ্ধন্তু শিখাকারা কুণ্ডলী রক্তবিগ্রহা।
দেব্যাত্মিকা তু সা প্রোক্তা মদভিন্না নগাধিপ॥"

অর্থ। মূলাধারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগে অগ্নিশিখাকারা রক্তবর্ণা দেবীরূপা কুণ্ডলী। হে পর্ব্বতরাজ! এই কুণ্ডলী আমা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধা।

এই শক্তি ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই ত্রিবিধশক্তিরূপে বিরাজিতা। গোরক্ষসংহিতায় আছে,—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥
জ্ঞানং গৌরী শক্তিরিচ্ছা ব্রাহ্মী শক্তিঃ।
ক্রিয়া বৈষ্ণবী শক্তিরিতি ত্রিধা ত্রিপ্রকারা॥"

অর্থ। শক্তি তিন প্রকার,—জ্ঞানরূপা গৌরী (মাহেশ্বরী) শক্তি, ইচ্ছারূপা ব্রাহ্মী শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিরূপা বৈষ্ণবী শক্তি বা লক্ষ্মী, এই ত্রিবিধা শক্তি। যেখানে এই ত্রিবিধশক্তির স্থান, তাহার অতীতই চিৎ-জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মস্থান।

মূলাধার হইতে নাভিচক্র পর্য্যন্ত ইচ্ছাশক্তিরূপা ব্রাহ্মী শক্তির স্থান; ইহাকে অধঃশক্তি কহে। নাভি হইতে কণ্ঠচক্র পর্য্যন্ত ক্রিয়াশক্তিরূপা বিষ্ণুশক্তির স্থান; এই বৈষ্ণবী শক্তিকে মধ্যশক্তি কহে। কণ্ঠচক্র হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত জ্ঞানশক্তিরূপা শিবশক্তির স্থান; এই শৈবী শক্তিকে ঊর্দ্ধশক্তি কহে। তদূর্দ্ধে শক্তির অতীত নিরঞ্জন নির্গুণ ব্রহ্ম। *

বৎস! শক্তি ও শক্তিমান্ বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শক্তি যখন নির্গুণ ব্রহ্মে অভিন্নভাবে লীন ছিল, তখন কোন সৃষ্টিই

---

* "ঊর্দ্ধশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠম্ অধঃশক্তির্ভবেদ্‌গুদঃ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যতীতং নিরঞ্জনম্॥"

ছিল না। ইহাই নির্ব্বিকার সৎস্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মভাব। ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে লীন হইলে, সাধক এই অবস্থা অনুভব করিতে পারেন। ইহাই ক্রিয়ার ও জ্ঞানের পরাবস্থা বা নির্ব্বিকল্পাবস্থা। এই অবস্থায় ইচ্ছা-ক্রিয়া-জ্ঞানময়ী সৃষ্টি অপ্রকট থাকে, সুতরাং ইহাই প্রলয়াবস্থা। মনে কর, সৃষ্টিকর্ত্তা যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সমাহিত হইয়া স্বরূপস্থ হইয়া থাকেন; তাহাই প্রলয়াবস্থা। সেই ব্রহ্ম ঈক্ষণ (মনন) করিলেন—'আমি বহু হইব'। এই ঈক্ষয়িত্রী শক্তি হইতেই ক্রমশঃ বহুরূপী বিচিত্র জগতের সৃষ্টি। এই শক্তিই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান ভেদে ত্রিবিধা। এই ব্রহ্মলীনা শক্তি যখন প্রথমে কার্য্যোন্মুখী হন, তখনই তাঁহাকে আদিকারণ বা সর্ব্বকারণকারণ কহে। ইহাই সৃষ্টির অব্যক্তাবস্থা বা প্রাথমিক অবস্থা। এই অবস্থায়ই ব্রহ্মকে 'সগুণ ব্রহ্ম' কহে। আজ্ঞাচক্রই সগুণ ব্রহ্মের স্থান, এই স্থানে মনোনিবেশ হইলে সাধকের আদিকারণের উপলব্ধি হয়; এখানেই সবিকল্প সমাধি।

সৃষ্টির এই অব্যক্ত অবস্থাকে কেহ কেহ 'তমঃ' নামেও আখ্যাত করেন। এই আদিতমস্ত্ব বা আদিকালত্ব নিবন্ধন এই পরমা শক্তিই 'কালী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এবং এইজন্য তাঁহার বর্ণও তমঃ বা অন্ধকারময় (মসীবর্ণ)। এখানে সর্ব্ববর্ণের বা সর্ব্বরূপের অভাব বলিয়াই ইনি তমোরূপা কৃষ্ণবর্ণা। বুঝিলে ত বৎস?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার কৃপায় একথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

গুরু। বেশ, তাহার পর শুন। চতুর্ব্বর্গই মা'র চারিখানি হাত। মায়ের ঊর্দ্ধ-দক্ষিণ হস্তই ধর্ম্মের প্রতীক। কোন্ ধর্ম্মের? যোগধর্ম্মের —পরমার্থসাধনরূপ ধর্ম্মের। এই ধর্ম্মের ফল হইতেছে অভয়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" (এই যোগধর্ম্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানও সাধককে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে)।

তাইত ৺মা তাঁহার ঐ ধর্ম্মহস্তে 'অভয়'-চিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন। তাহার পর তাঁহার অধো-দক্ষিণ হস্তটী অর্থের প্রতীকরূপে বর্ত্তমান। 'অর্থ' শব্দে বুঝায় প্রয়োজন—অভাববোধ। ৺মা তাঁহার এই হস্তদ্বারা তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীল সন্তানের সর্ব্ব অভাব পূরণ করিয়া থাকেন—সর্ব্ব অর্থ যোগাইয়া থাকেন।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
[শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা]

অর্থ। [শ্রীভগবান্ বলিতেছেন]—যে সকল সাধক অন্য কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই চিন্তা সহকারে উপাসনা করে, আমার চিন্তায় নিত্যযুক্ত সেই ভক্তদিগের যোগ ও ক্ষেম আমিই নির্ব্বাহ করি।

এখানে অলব্ধ আবশ্যকীয় বস্তুর অভাবপূরণের নামই 'যোগ', আর লব্ধ বস্তুর রক্ষার নামই 'ক্ষেম'। তবেই দেখ, একান্ত নিষ্ঠাবান্ ভগবৎপরায়ণ সাধকের 'অর্থ' (বা প্রয়োজনীয় বিষয়) উপার্জ্জন ও রক্ষার জন্য চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। এইরূপ সাধক কেবল তাঁহার পরমার্থের (মোক্ষের) চিন্তায়ই বিভোর থাকেন, তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনাদি সামান্য অর্থসমূহ ৺মায়ের কৃপায় বিনা চেষ্টায়ই লব্ধ হইয়া থাকে,—৺মা সেইরূপ সাধকের ঐহিক প্রয়োজন নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বদাই বরদানে উদ্যতা হইয়া আছেন; তাই আমার মা তাঁহার ভক্ত সন্তানের জন্য হস্তে 'বর' ধারণ করিয়াই আছেন;—সন্তানের যখন যাহা প্রয়োজন মায়ের বরে তাহাই নির্ব্বাহিত হইতেছে।

তাহার পর ৺মায়ের অধোবাম হস্তখানি হইতেছে ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ 'কাম' বা ভোগবাসনার প্রতীক। * তাঁহার ভক্তসন্তানের যখন যাহা

* ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ। [শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা]

ভোগের কামনা হয়, তাহাও ৺মা অত্যাশ্চর্য্যরূপে পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ৺মায়ের কৃপা হইলে পর সাধকের ভোগবাসনা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে যখন সম্যক্ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন ঐ বাসনা বা কাম সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বকামনা-নিবৃত্তিহেতু তিনি মোক্ষলাভ করেন। ৺মায়ের ঊর্দ্ধ-বাম হস্তখানি তাঁহার মোক্ষহস্ত; এই হস্তে তিনি ভোগবাসনা বা কামাসুরের ছেদন-কারী জ্ঞানরূপ অসি এবং বিশুদ্ধ বাসনার প্রতীকরূপ অধো বাম হস্তে কামাসুরের ছিন্নমুণ্ড ধারণ করিয়া আছেন। এইজন্যই ৺মা চতুর্ব্বর্গরূপ চারি হাতে বর, অভয়, অসি ও মুণ্ড ধারণ করিয়া আছেন। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"আয় মন বেড়াতে যাবি,
কালী-কল্পতরু-মূলে রে মন চারি ফল কুড়া'য়ে খাবি।"

বিশ্বব্যাপিনী মা'র লজ্জা নিবারণ করিতে পারে, এই জগতে এমন বস্ত্র কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই ৺মা আকাশাম্বরা (উলঙ্গিনী)। আমার মা'র কোন প্রকার বন্ধনই নাই, তিনি নিত্যমুক্তা; তাই তাঁহার মুক্তকেশ। ৺মায়ের গলায় মুণ্ডমালা। বৎস! পূর্ব্বে একদিন তোমাকে বলিয়াছি যে, ৺মা কুলকুণ্ডলিনী হইতেই সর্ব্ববর্ণের উৎপত্তি; ইনি বর্ণময়ী ও সকলবীজমন্ত্রস্বরূপা। বর্ণযোজনাদ্বারাই শব্দ হয় এবং শব্দ হইতেই জ্ঞান হয়; জ্ঞানের স্থান মস্তক। তাই বর্ণমালার পরিবর্ত্তে মুণ্ডমালা দেখান হইয়াছে। ভক্ত কমলাকান্ত গাহিয়াছিলেন—

"আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশিভালী,
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন মুণ্ডমালা তুই কোথা পেলি।"

মা আমার ঘোর-দংষ্ট্রা-করালবদনা, ইহাই প্রলয়ের চিহ্ন। সকল

প্রাণী তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারা প্রলয়ে আবার তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে। তিনি ব্রহ্মাণীরূপে সৃষ্টি করেন, বৈষ্ণবীরূপে পালন করেন এবং তিনিই পুনঃ রুদ্রাণী বা কালীরূপে নিজ দেহেই সমস্ত জীব জগতকে সংহরণ করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভকালে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলে অর্জ্জুন ভগবদ্দেহে প্রলয়ভাব দর্শনে ভীত হইয়া স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন,—

"দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥"

অর্থ। তোমার দংষ্ট্রাকরাল, প্রলয়াগ্নিসদৃশ মুখসমূহদর্শনে আমার দিগ্‌ভ্রম হইতেছে, মনে সুখ পাইতেছি না; হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণ, রাজমণ্ডলী এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এই বীরত্রয় আমাদের পক্ষীয়

যোদ্ধৃবর্গের সহিত তোমাতে—তোমার অতিভীষণ দংষ্ট্রাকরাল মুখবিবরে বেগে প্রবেশ করিতেছে; ইহাদের কাহারও কাহারও মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, দেখিতেছি কেহ কেহ বা তোমার বিশাল দন্তের সন্ধিস্থলে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হে ভগবন্! যেমন বহু-ধারাপ্রবাহিত নদীর জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখ হইয়া তাহাতেই গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ মনুষ্যলোকমধ্যে এই বীরগণ তোমার সর্ব্বতঃ প্রকাশিত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। হে ভগবন্! যেমন পতঙ্গসমূহ অতিবেগে ধাবিত হইয়া নিজ মরণজন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকল নিজ নিজ মরণজন্য অতিবেগে তোমার মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইতেছে। হে বিষ্ণো! তুমিও যেন সমগ্রলোকের গ্রাসাভিলাষী হইয়া নিজ প্রদীপ্তবদন চতুর্দ্দিকে বিস্তারপূর্ব্বক বীরগণকে ভক্ষণ করিতেছ; এবং তোমার অত্যুগ্র প্রদীপ্ত তেজঃসমূহদ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ করিয়া উহাকে সন্তপ্ত করিতেছ।

দেখ বৎস, আমাদের মুখেই না কত প্রাণী ভক্ষিত হইতেছে! আমাদের ভোজ্য যাহা কিছু সবই প্রাণী; এইরূপ এই জগতে যত জীবজন্তু আছে, প্রত্যেকেরই আহার্য্যবস্তু প্রাণী—সর্ব্বজীবজন্তুর ভিতরে থাকিয়া একমাত্র প্রাণশক্তি জগতের যাবতীয় প্রাণিবর্গকে ভক্ষণ করি-তেছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—

> "স হোবাচ কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি, যৎকিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য
> আশকুনিভ্য ইতি।"

অর্থ। তিনি (প্রাণ) বলিলেন 'আমার অন্ন কি হইবে?'—'ভূমিস্থিত কুক্কুর হইতে আকাশস্থ শকুনি পর্য্যন্ত (ভূচর ও খেচর) যত কিছু প্রাণী আছে, সকলই অন্ন হইবে।'

সুতরাং জগতের প্রাণীমাত্রই প্রাণের অন্ন,—প্রাণ সর্ব্বপ্রাণীকে ভক্ষণ বা আত্মসাৎ করিয়া স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা ও পুষ্টিবর্দ্ধন করিতেছে। সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যে, এক প্রাণী ভোক্তারূপে এবং অন্য প্রাণী তাহার ভোজ্যরূপে বর্ত্তমান। এইরূপে যে ভোজ্যরূপে আমাদের নিকট উপস্থিত, হয়ত তাহা অন্য প্রাণীর ভোক্তারূপে বর্ত্তমান ছিল। এইভাবে এই জগৎ পরস্পরই পরস্পরের আহার্য্য। এই আহারক্রিয়া মুখদ্বারাই হয়। এইজন্য মুখই প্রলয়স্থান। স্পৃহা বা লোভ জিহ্বায়ই বর্ত্তমান। জিহ্বার সংযমে স্পৃহারও সংযম হয়। তাই মা লোলজিহ্বাদ্বারা দেখাইতেছেন যে, তিনি সৃষ্টি. স্থিতি ও সংহার-কর্ত্রী হইয়াও, সেই সকলে সম্পূর্ণ স্পৃহারহিতা—নির্লিপ্তা—নিরহঙ্কারা—কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিতা—কার্য্য করিয়াও অকর্ত্রী। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা" (যিনি আপ্তকাম, তাঁহার আবার কোন্ বস্তুর জন্য স্পৃহা হইবে?) কোন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি এই জগৎ রচনা করেন নাই; এতাবৎ, তাঁহার প্রকৃতিসুলভ জলতরঙ্গলীলা মাত্র। ৺মায়ের এইভাব যিনি বুঝিতে সমর্থ হন, তিনি সংসারে আবদ্ধ হন না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥"

অর্থ। কর্ম্মরাশি আমাকে স্পর্শ করে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহাও নাই। যে আমাকে এইরূপ জানে, সে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হয় না।

দেখ বৎস! নির্গুণ চৈতন্যের উপরেই নাম ও রূপ ভাসিতেছে, যেন জলের উপরেই জলের তরঙ্গ খেলিতেছে;—তরঙ্গের আশ্রয় যেমন জল, তদ্রূপ শক্তির আশ্রয় নির্গুণ চৈতন্য। নির্গুণ চৈতন্যরূপী শিব যখন শক্তিযুক্ত হন, তখনই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও

প্রলয় কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হন না। অগ্নির উষ্ণতা, সূর্য্যের দীধিতি এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় ইহা চৈতন্যস্বরূপ শিবের স্বাভাবিকী নিত্যশক্তি। এই শক্তি, আকাশে মেঘদ্বারা নানাদৃশ্যরচনাবৎ, নির্গুণ চৈতন্যের উপর নানা সৃষ্টি রচনা করিতেছেন। তাই তিনি কালীরূপে নির্গুণ চৈতন্য-স্বরূপ শবরূপী শিবের উপরে দণ্ডায়মানা।

বৎস! সাকারা অথচ নিরাকারা, সগুণা অথচ নির্গুণা চৈতন্য-স্বরূপিণী মাকে দর্শন করিতে চাও ত মূলাধারস্থা কুণ্ডলিনীশক্তির উপাসনা কর। সাধকের গুরু-প্রদর্শিত উপায়ে ৺মা কুণ্ডলিনীশক্তি যখন অধঃ-শক্তি, মধ্যশক্তি ও উৰ্দ্ধশক্তিকে স্বীয় অঙ্গে লীন করিয়া সহস্রারে ব্রহ্ম-রন্ধ্রে উপনীত হন, তখন সর্ব্বপ্রকার কামনা বা সংকল্পরাশির নিরোধানন্তর নিরাকার নির্ব্বিকার অখণ্ডচৈতন্যস্বরূপ শিবের সহিত একীভূতা হইয়া তিনিও নিরাকারা ও নির্ব্বিকারা হইয়া যান। যখন সাধকের যোগ বা সমাধিদ্বারা এই তত্ত্বটীর উপলব্ধি হয়, তখনই তাঁহারও সংকল্পরাশি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই তাঁহার 'স্বরূপে' স্থিতি হয়—মনের সংকল্পসমূহ নষ্ট হইলে পর যাহা থাকে তাহাই 'স্বরূপ'। * 'স্বরূপ' অর্থাৎ নিজ রূপ বা আত্মার রূপ। স্বরূপই চৈতন্য, ইহাই যোগীর আত্মা বা নিজবোধ। এই তত্ত্বই শিব বা বিষ্ণু-উপাসকের শিব বা বিষ্ণু, এবং শক্তি-উপাসকের সচ্চিদানন্দময়ী মা। সহস্রদলকমলস্থিত ব্রহ্ম-রন্ধ্রেই এই তত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে; সুতরাং উহাই কি যোগী, কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব, সকলেরই উপাস্য স্থান। ষট্‌চক্রে আছে,—

* "সংকল্পজাতে গলিতে স্বরূপমবশিষ্যতে।" [মহোপনিষৎ]

"শিবস্থানং শৈবা পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষস্থানমমলম্॥"

অর্থ। এই স্থানকে শৈবগণ শিবস্থান, বৈষ্ণবগণ পরমপুরুষ (হরি)-স্থান, অপর কেহ কেহ হরিহরপদ, এবং দেবীর পাদপদ্মভক্তগণ দেবীপদ (শক্তিস্থান) বলিয়া থাকেন। কোন কোন মুনিশ্রেষ্ঠ ইহাকে প্রকৃতি-পুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া অভিহিত করেন।

শিষ্য। গুরুদেব! আমাদের সকলেরই দুইটী নয়ন দেখিতে পাই; কিন্তু ৺মা ত্রিনয়নী কেন?

গুরু। বৎস! আমাদের সকলেরই এই দুই নয়ন ভিন্ন আরও একটী নয়ন আছে, যাহাকে 'দিব্যনেত্র' কহে। এই দিব্যনেত্র গুরু-কৃপায় খুলিয়া যায়। জ্ঞানচক্ষুই দিব্যনেত্র। এই জড়চক্ষুদ্বারা আমরা জড় নাম ও রূপই দর্শন করি; কিন্তু নাম ও রূপের অন্তরালে যে চৈতন্য আছেন, যাঁহাকে জানিলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান লাভ হয়, তাঁহাকে এই চক্ষুদ্বারা দর্শন বা অনুভব করা যায় না। তাই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥"

অর্থ। তুমি নিজ (সামান্য) চক্ষুদ্বারা আমাকে (অর্থাৎ আমার এই বিশ্বরূপ) দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টিশক্তি দান করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার ঐশ্বরিক যোগ (অতীন্দ্রিয়স্বরূপ) দর্শন কর।

বৎস! গুরুপ্রদর্শিত উপায়ে মূলাধারস্থশক্তিসহ মনকে আজ্ঞা-চক্রে স্থির করিতে পারিলে সবিকল্প-সমাধিযোগে সাধকের এই দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। তখন এই দৃষ্টিদ্বারা সাধক কূটস্থ চৈতন্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনুভব করিতে পারেন। এখানেই সাধকের কূটস্থ চৈতন্যে বিশ্বরূপ দর্শন হয়, অর্থাৎ তখন সাধক নিজ চৈতন্যেই বিশ্ব অনুভব করিতে থাকেন। সাধকের সাধনাদ্বারা এই দৃষ্টিলাভ করিতে হয়। কিন্তু ৺মা ভগবতীর এই দিব্যদৃষ্টি নিত্যই আছে, তাই তিনি সর্ব্বজ্ঞা। এই নিমিত্ত তাঁহার এই দিব্যনেত্রটী ভ্রূমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

চতুর্থ বিবৃতি

শিষ্য। গুরুদেব! এই কয়দিন আপনার উপদেশামৃত পানে মনের অনেক সংশয় দূরীভূত হইয়াছে এবং যোগসাধনার জন্য মনে তীব্র বাসনার উদয় হইতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনার উপদিষ্ট সাধনায় সকলেরই অধিকার আছে কি না? এবং মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ, এই চারি প্রকার যোগমধ্যে, আমাকে কোন যোগের অধিকারী মনে করেন?

গুরু। বৎস! মদুপদিষ্ট এই সিদ্ধযোগ বালক, যুবক ও বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে সকলেই অনায়াসে সাধন করিতে পারে। হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে,—

"যুবা বৃদ্ধোঽতিবৃদ্ধো বা ব্যাধিতো দুর্ব্বলোঽপি বা।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি সর্ব্বযোগেষ্বতন্দ্রিতঃ॥"

অর্থ। যুবা, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা দুর্ব্বল ব্যক্তিও, অনলস ভাবে অভ্যাস করিলে মন্ত্রহঠাদি সর্ব্বযোগেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

হে পুত্র! যেমন একটী বিদ্যালয় কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তাহা একটীই বিদ্যালয় বটে, তদ্রূপ যোগ, মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও, একই যোগ বটে। যোগ-শিখোপনিষদে আছে,—

"মন্ত্রো লয়ো হঠো রাজযোগোঽন্তর্ভূমিকাঃ ক্রমাৎ।
এক এব চতুর্ধাঽয়ং মহাযোগোঽভিধীয়তে॥"

অর্থ। মন্ত্র, লয়, হঠ ও রাজযোগ, এই চারিটী ক্রমান্বয়ে এক যোগেরই অন্তর্ভূমিকা মাত্র। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত হইলেও একই

যোগ। এক যোগে চারি যোগ আছে বলিয়াই ইহাকে (এই 'সিদ্ধ-যোগকে') 'মহাযোগ'ও বলা যায়।

এই 'সিদ্ধ মহাযোগ' প্রাপ্ত হইলে মন্ত্র-হঠাদি যোগসমূহের পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সাধনা আবশ্যক হয় না। শ্রীগুরুকৃপায় আপনা হইতেই এই সব পরপর হইতে থাকে। সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রযোগের এবং সর্ব্বশেষে রাজযোগের সাধনা। গুরুকর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত হইলে প্রথমে মন্ত্র-যোগের সাধনা আরম্ভ হয়; মন্ত্রজপাদি হইতে হঠযোগ অর্থাৎ আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম হইতে থাকে; প্রাণায়াম হইতে লয়যোগ অর্থাৎ প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান, এবং ধ্যান হইতে রাজযোগ অর্থাৎ সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়। অগ্রে সবিকল্প সমাধি এবং পরে তাহা হইতেই নির্ব্বিকল্প সমাধি আইসে; এইজন্য সবিকল্প সমাধিকে সাধনা এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিকে তাহার ফল কহে। তোমার বিশেষ বোধের জন্য এখানে মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ যোগ পৃথক্ পৃথক্ দেখান যাইতেছে, মনোযোগ করিও :

(১) মন্ত্রযোগ—

"মন্ত্রজপান্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ।"

অর্থ। ওঁকারাদি মন্ত্র (নিজ নিজ গুরুদত্ত ইষ্টদেবের বীজমন্ত্র বা নাম) জপ করিতে করিতে যে মনোলয় সাধন করা, তাহাই মন্ত্রযোগ।

(২) হঠযোগ—

"হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাদ্ধঠযোগো নিগদ্যতে॥"

অর্থ। সূর্য্য (পিঙ্গলা) নাড়ীকে 'হ'কার এবং চন্দ্র (ইড়া) নাড়ীকে 'ঠ'কার বলা হয়; এই সূর্য্য ও চন্দ্রের (অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ইড়া নাড়ীতে প্রবাহিত প্রাণপ্রবাহদ্বয়ের) একত্র মিলনকে 'হঠ'যোগ বলে।

[কেহ কেহ হৃদয় হইতে মুখ ও নাসিকা পর্য্যন্ত গতিরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণবায়ুকে 'সূর্য্য' এবং নাভি হইতে পাদতল পর্য্যন্ত গতিরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট অপানবায়ুকে 'চন্দ্র' কহেন। এই প্রাণ ও অপান বায়ুর সংযোগ-সাধনকেও হঠযোগ বলে]।

(৩) লয়যোগ—

"প্রণষ্টশ্বাসনিশ্বাসঃ প্রধ্বস্তবিষয়গ্রহঃ।
নিশ্চেষ্টো নির্ব্বিকারশ্চ লয়ো জয়তি যোগিনাম্॥"

[হঠযোগ-প্রদীপিকা]

অর্থ। বাহ্যবায়ুর অন্তঃপ্রবেশকে শ্বাস এবং অন্তরস্থ বায়ুর বহির্নিঃসরণকে নিঃশ্বাস কহে। যে অবস্থায় এই শ্বাস-নিশ্বাস বিলীন হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় কোন বিষয় গ্রহণ করে না, কোন প্রকার দৈহিক চেষ্টা থাকে না, মানসিক ব্যাপার সকল অন্তর্হিত হওয়ায় চিত্ত নির্ব্বিকার হয়, সেই অবস্থাকে 'লয়' কহে। এই লয় যোগীরাই প্রাপ্ত হন।

(৪) রাজযোগ—

"কুম্ভকপ্রাণরোধান্তে কুর্য্যাচ্চিত্তং নিরাশ্রয়ম্।
এবমভ্যাসযোগেন রাজযোগপদং ব্রজেৎ॥"

[হঠযোগ-প্রদীপিকা]

অর্থ। কুম্ভকযোগে প্রাণরোধদ্বারা চিত্তকে নিরালম্ব করিবে। এইরূপ অভ্যাসযোগদ্বারা "রাজযোগ" পদ লাভ হইয়া থাকে।

হে বৎস! ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণদ্বারা অন্তঃকুম্ভক হয়। এই অন্তঃকুম্ভকে প্রাণ সুষুম্নাপথে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহিত প্রাণ ভ্রূর কিঞ্চিদূর্দ্ধে নিরালম্বপুরীতে রুদ্ধ হইলে চিত্তও নিরালম্ব হয়, অর্থাৎ তখন কিছু অবলম্বন ভিন্নই চিত্ত স্থির হয়। তখন বোধ হয় যেন 'আমি আদি ও অন্তবিহীন আকাশের ন্যায় শূন্য।' ইহাই

চিদাকাশ। এই সময় মন হইতে বাহ্যবিষয়চিন্তা আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়, অত্যন্ত নেশা অনুভূত হয়, অর্দ্ধনিমীলিতভাবে চক্ষুর দৃষ্টি ভ্রূমধ্যে থাকে, এবং প্রাণ তখন নাসার অভ্যন্তরেই বিচরণ করে। ইহাই রাজযোগাবস্থা। এইরূপ দীর্ঘকাল অভ্যাসদ্বারা যোগী ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করিয়া সর্ব্বপ্রকার ইচ্ছারাহিত্যাবস্থা প্রাপ্ত হন এবং শেষে মুক্তিলাভ করেন। গীতায়ও আছে,—

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥"

অর্থ। মন হইতে বাহ্যবিষয়সকল বিদূরিত করিয়া, চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক প্রাণ ও অপান বায়ুকে নাসামধ্যে অবরোধ করিয়া যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনকে সংযত করিয়াছেন, এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধকে সকল সময়ের জন্য দূর করিয়াছেন, এমন মোক্ষপরায়ণ মননশীল সাধকই মুক্ত হন।

হঠযোগপ্রদীপিকায় আছে,—

"রাজযোগস্য মাহাত্ম্যং কো বা জানাতি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধির্গুরুবাক্যেন লভ্যতে॥"

রাজযোগের প্রকৃত মাহাত্ম্য কে অবগত আছে? গুরুবাক্যানুসারে রাজযোগ সাধন করিতে পারিলে জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান, ব্রাহ্মী স্থিতি অর্থাৎ অখণ্ডচৈতন্যে, মনের স্থিরতা, মুক্তি অর্থাৎ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপ পরমানন্দপ্রাপ্তি এবং সিদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টপ্রকার সিদ্ধি লাভ হয়।

হে বৎস! প্রথম মন্ত্রযোগ এবং সর্ব্বশেষ রাজযোগ। মন্ত্র এবং হঠ (অর্থাৎ প্রাণাপানের একতা) ভিন্ন কেহ কখনও রাজযোগ লাভ

করিতে পারে না, যেমন কর্ম্ম না করিয়া কেহ কখনও কর্ম্মের পরাবস্থা লাভ করিতে পারে না। কর্ম্মের পরাবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি কেহ কর্ম্মত্যাগ করে, তবে তাহার শান্তিরূপ পরমসিদ্ধিলাভ হয় না। মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতা আছে বলিয়াই ত জপ, স্তব, পূজা ও প্রাণায়ামাদি সাধনারূপ কর্ম্মের প্রয়োজন। সাধনাদ্বারা মনের চঞ্চলতা দূর না করিয়া মনকে নিরালম্ব করিবার চেষ্টা করিতে গেলে, মনের স্থিরতারূপ রাজযোগের পরিবর্ত্তে নানা চিত্তবিক্ষেপই উপস্থিত হয়, এবং সাধককে ক্লেশ দিতে থাকে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

অর্থ। পুরুষ চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে নিষ্ক্রিয়ভাব (অর্থাৎ কর্ম্মের পরাবস্থাস্বরূপ জ্ঞান) প্রাপ্ত হয় না। এই জ্ঞানপ্রাপ্তির পূর্ব্বে কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে (অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ করিলে) মোক্ষরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

বৎস! শুদ্ধ এবং অশুদ্ধভেদে মন বা চিত্ত দুই প্রকার—

"মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং বাশুদ্ধমেবচ।
অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্॥"

[অমৃতবিন্দুপনিষৎ]

অর্থ। শুদ্ধ ও অশুদ্ধভেদে মন বা চিত্ত দুই প্রকারের কথিত হয়। কামসংকল্পবিশিষ্ট মনই অশুদ্ধ এবং বাসনাবিবর্জ্জিত মনই শুদ্ধ।

কামসংকল্পদ্বারাই মন চঞ্চল হয় এবং বাসনাবিবর্জ্জিত হইলেই স্থির হয়। এই স্থির বা শুদ্ধচিত্তেই জীবব্রহ্মের ভেদজ্ঞাননাশকারী—"আমি চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম" এইরূপ বৃত্তিজ্ঞানের উদয় হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি কি কি? এবং কোন্ অবস্থায় সাধকের ঐ সকল সিদ্ধিলাভ হয়?

গুরুদেব। বৎস! তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য বলিতেছি; কিন্তু সাবধান, কখনও 'সিদ্ধি সিদ্ধি' করিয়া মহাসিদ্ধিস্বরূপ আত্মতত্ত্ব হইতে বিচলিত হইও না।

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব এবং যত্রকামাবসায়িত্ব, এই অষ্টপ্রকার সিদ্ধি।

১। অণিমা—স্বীয় শরীরকে স্বেচ্ছানুসারে অতি সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা। দেবগণ ও সিদ্ধগণ এই সিদ্ধিবলে ইচ্ছানুরূপ সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া সকলের অলক্ষ্যভাবে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

২। মহিমা—স্বীয় শরীরকে স্বেচ্ছানুরূপ মহৎ অর্থাৎ বৃহৎ করিবার ক্ষমতা।

৩। লঘিমা—স্বীয় শরীরকে স্বেচ্ছানুরূপ লঘু অর্থাৎ হাল্কা করিবার ক্ষমতা। এই ক্ষমতাবলে স্বচ্ছন্দে আকাশপথে গমন করা যায়।

৪। প্রাপ্তি—এক স্থানে বসিয়া সর্ব্বস্থানস্থিত-বস্তু-গ্রহণ-সামর্থ্য।

৫। প্রাকাম্য—ইচ্ছানুরূপ ভোগপ্রাপ্তির বাধাশূন্যতা।

৬। ঈশিত্ব—স্বামিত্বরূপ ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ সকলের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা।

৭। বশিত্ব—সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা।

৮। যত্রকামাবসায়িত্ব—ইচ্ছামাত্র অভিলষিত বস্তুর উপস্থিতি।

হে বৎস! এই অষ্টসিদ্ধি কল্পিত ও অকল্পিত ভেদে দুই প্রকার। মন্ত্র, ঔষধ এবং তপস্যাদিদ্বারা যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তাহাই কল্পিত; ইহা অনিত্য ও অল্পবীর্য্য। আর, দীর্ঘকাল কামনারহিত হইয়া যোগসাধনা

করার পর এক অখণ্ডচৈতন্যের সাক্ষাৎকারদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের একতাবিষয়ে দৃঢ়জ্ঞান হওয়ায়, স্বভাবতঃই যে সিদ্ধিসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই অকল্পিত সিদ্ধি; এইরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইলে 'তাহা অমোঘ ও নিত্যস্থায়ী; কারণ সাধকের তখন ঈশ্বরের সহিত একত্ব-ভাববশতঃ তিনি ঈশ্বরের ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্যসমূহের পূর্ণাধিকারী হন। যোগশিখা শ্রুতিতে আছে,—

"রসৌষধি-ক্রিয়াজাল-মন্ত্রাভ্যাসাদি-সাধনাৎ।
সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ো যাস্তাঃ কল্পিতাস্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অনিত্যা অল্পবীর্য্যাস্তাঃ সিদ্ধয়ঃ সাধনোদ্ভবাঃ।
সাধনেন বিনা ত্বেবং জায়ন্তে স্বত এব হি॥
স্বাত্মযোগৈকনিষ্ঠেষু স্বাতন্ত্র্যাদীশ্বরপ্রিয়াঃ।
প্রভূতাঃ সিদ্ধয়ো যাস্তাঃ কল্পনারহিতাঃ স্মৃতাঃ॥
সিদ্ধা নিত্যা মহাবীর্য্যা ইচ্ছারূপাঃ স্বযোগজাঃ।
চিরকালাৎ প্রজায়ন্তে বাসনারহিতেষু চ॥"

অর্থ। ধাতব রসবস্তু, উদ্ভিজ্জ ঔষধ, নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠান কিংবা মন্ত্রাভ্যাসাদি সাধনাদ্বারা যে সকল সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা 'কল্পিত সিদ্ধি বলিয়া কথিত। এই সকল সাধনোদ্ভব (আয়াসসাধ্য) সিদ্ধিসমূহ অনিত্য ও অল্পবীর্য্য অর্থাৎ এই সব সিদ্ধির প্রতি মানুষের চেষ্টা ও দ্রব্যাদিসংগ্রহই কারণ বলিয়া উহারা নিত্যস্থায়িফলদায়ক হয় না এবং অনুষ্ঠান অঙ্গহীন হইলে একেবারেই নিষ্ফল হইয়া থাকে। আর, সর্ব্ববিষয়ে স্বতন্ত্র (স্বাধীন), স্বাত্মযোগনিষ্ঠ সিদ্ধপুরুষদিগের নিকট বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি যে প্রভূত সিদ্ধিসমূহ উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে কল্পনারহিত (অকল্পিত) সিদ্ধি বলা যায়; বাসনারহিত যোগীদিগের দীর্ঘকাল যোগসাধনার পর, আত্মযোগ হইতেই সিদ্ধিসমূহ উৎপন্ন হইয়া

থাকে। ইহারা সিদ্ধপুরুষদিগের ইচ্ছারই রূপ বলিয়া নিত্য ও মহাবীর্য্য, অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষদিগের মনে ইচ্ছার উদয় হওয়া মাত্রই তত্তৎসিদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ সিদ্ধিসমূহ তাঁহাদের নিত্য অধিকৃত ও অমোঘফলদায়ক।

শিষ্য। গুরুদেব! পূর্ব্বে আপনার উপদেশে বুঝিতে পারিয়াছি যে, কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইলে একমাত্র মন্ত্র বা ধ্যানাদিদ্বারা স্বতঃই আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাদি হইতে থাকিবে, এবং ক্রমে পরমসিদ্ধি অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কি প্রকার অধিকারী কতদিনে এই সাধনায় সেই পরমসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে?

গুরু। বৎস! মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র এবং অধিমাত্রতম ভেদে সাধক চারি প্রকার। তন্মধ্যে কোন্ সাধক কতদিনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, তাহা তোমাকে বিস্তারিতভাবে বলিতেছি।

(১) মৃদুসাধক—মন্দোৎসাহী অর্থাৎ সামান্য উৎসাহসম্পন্ন, প্রতিভাবিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত, গুরুদূষক অর্থাৎ যে গুরুর কার্য্যাদিতে দোষারোপ করে বা গুরুনিন্দা করে, যে লোভী, পাপকার্য্যে আকৃষ্ট, বহুভোজনশীল, স্ত্রীজিত, চপল, পরিশ্রমে কাতর, পরাধীন, অতিনিষ্ঠুর, মন্দাচার, মন্দবীর্য্য, এমন সাধককেই 'মৃদুসাধক' কহা যায়। ঈদৃশ অধিকারী বিশেষ যত্ন করিলে দ্বাদশ বৎসরে সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ আত্মচৈতন্যসাক্ষাৎকার করিতে পারিবে।

(২) মধ্যসাধক—যিনি সমবুদ্ধি, ক্ষমাশীল, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়বাদী এবং যিনি কোন কার্য্যেই লিপ্ত নহেন, এইরূপ সাধককে 'মধ্যসাধক' কহে। ঈদৃশ অধিকারী বিশেষ চেষ্টা করিলে ৯ বৎসরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

(৩) অধিমাত্র সাধক—যিনি স্থিরবুদ্ধি, লয়সাধনে নিরত, স্বাধীন, বীর্য্যশালী, মহাশয়, দয়াশীল, ক্ষমাবান্, সত্যনিষ্ঠ, শৌর্য্যশালী, গুরুপাদ-পদ্মপূজাপরায়ণ ও যোগাভ্যাসে নিয়ত নিরত, এরূপ সাধককে 'অধি-মাত্র সাধক' বলা যায়। ঈদৃশ অধিকারী বিশেষ যত্নসহকারে অভ্যাস করিলে ৬ বৎসরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

(৪) অধিমাত্রতম সাধক—যিনি মহাবীর্য্য, মহোৎসাহসম্পন্ন, মনোজ্ঞ, শৌর্য্যশালী, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল, মোহশূন্য, নিরাকুল, নবযৌবনসম্পন্ন, মিতাহারী, বিজিতেন্দ্রিয়, নির্ভীক, বিশুদ্ধাচার, সুদক্ষ, দাতা, সর্ব্বজনের প্রতি অনুকূল, সর্ব্ববিষয়ে অধিকারী, স্থিরচিত্ত, ধীমান্, যথেচ্ছস্থানাবস্থিত, ক্ষমাবান্, সুশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, গুপ্তচেষ্ট, প্রিয়ম্বদ, শান্ত, বিশ্বাসসম্পন্ন, দেব-গুরু-পূজাপরায়ণ, জনসঙ্গবিরক্ত, মহাব্যাধিপরিশূন্য, সর্ব্ববিষয়েই অগ্রগণ্য এবং ব্রহ্মজ্ঞ, এরূপ সাধককে 'অধিমাত্রতম সাধক' বলে। ঈদৃশ অধি-কারী বিশেষ যত্নসহকারে সাধন করিলে ৩ বৎসর মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। *

বৎস! যিনি যে প্রকারের অধিকারী হউন না কেন, যদি যত্ন-সহকারে গুরুদত্ত ক্রিয়া অভ্যাস না করেন, তবে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে না। ক্রিয়াই সিদ্ধির মূল। হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে,—

"ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ।
ন শাস্ত্রপাঠমাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
ন বেশধারণং সিদ্ধেঃ কারণং ন চ তৎকথা।
ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ॥"

---

* চারি প্রকার সাধকের লক্ষণ শিবসংহিতায় আছে, এখানে তাহারই অনুবাদ দেওয়া হইল। কেহ ইচ্ছা করিলে মূল দেখিবেন।

অর্থ। গুরুদত্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেই যোগসিদ্ধ হওয়া যায়; ক্রিয়ায় বিরত হইলে কিরূপে সিদ্ধিলাভ হইবে? কেবল শাস্ত্রপাঠদ্বারা যোগসিদ্ধি হয় না। যোগীর বেশ অর্থাৎ কাষায় বসনাদি ধারণ করিলেই যে যোগসিদ্ধি হইবে তাহাও নহে; কিংবা যোগের কথা আলোচনা বা বক্তৃতা করিলেও যোগী হওয়া যায় না। ফলতঃ ক্রিয়াই সিদ্ধির মূল কারণ—গুরুদত্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারাই যোগসিদ্ধি হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

দেখ বৎস! কোন সময় একটী যুবক কোন মহাত্মা সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া বৈরাগ্য-বসন প্রার্থনা করে। তাহার উত্তরে সন্ন্যাসী বলেন 'বৎস, পুরুষ স্ত্রীলোকের বেশে সত্যই স্ত্রীলোক হয় কি?' তাহা যেমন হয় না, তদ্রূপ ক্রিয়ানুষ্ঠান ব্যতীত যোগীর বসন পরিধান করিলেই যোগী হওয়া যায় না।

শিষ্য। গুরুদেব! ভবদুপদিষ্ট সাধনা বা ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোন নিয়ম পালন করিতে হইবে কি?

গুরু। হাঁ, বৎস! যম ও নিয়ম সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাস করিতে হইবে। যেমন আরোগ্যের মূলকারণ ভেষজ (ঔষধ) হইলেও, আনুষঙ্গিক কারণ পথ্যাদিরও প্রয়োজন, তদ্রূপ গুরুদত্ত ক্রিয়ারূপ যোগানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যম-নিয়ম অনুষ্ঠানেরও দরকার।

শিষ্য। পিতঃ! যম ও নিয়ম কি, তাহা আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু। হে পুত্র! অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটীকে 'যম' এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটীকে 'নিয়ম' কহে। তোমার বোধের নিমিত্ত প্রত্যেকটী বিশদভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যম-পঞ্চক।

(১) অহিংসা—কায়-মনোবাক্যে কোন প্রাণীকে কোন প্রকার ক্লেশ না দেওয়ার নাম 'অহিংসা', অথবা সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রকারে প্রাণিগণের প্রতি বিদ্রোহভাব পরিত্যাগকে 'অহিংসা' বলে। * এই অহিংসা জাতি, দেশ এবং কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতে পারে। যেমন ধীবরগণের মৎস্যজাতির হিংসা করাই ব্যবসায়; ধীবরদিগের মধ্যে কেহ যদি স্বীয় ব্যবসায়ের বাধ্য হইয়া মৎস্যহিংসা পরিত্যাগ করিতে না পারায়, অন্য সকলের প্রতি অহিংসাপরায়ণ হয়, তাহা হইলে এই অহিংসা জাতিদ্বারা সীমাবদ্ধ হইল বলা যায়। কোন কোন ব্যক্তি তীর্থে গমন করিলে অহিংসা অবলম্বন করে, কিন্তু অন্যত্র হিংসা ত্যাগ করিতে পারে না; এস্থলে অহিংসা দেশদ্বারা সীমাবদ্ধ হইল। চতুর্দ্দশী ইত্যাদি পর্ব্বদিনে কিংবা অন্যান্য পুণ্যাহে মাত্র অহিংসা অবলম্বন করিলে, অহিংসা কালদ্বারা সীমাবদ্ধ হইল। এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ সময় বা উপলক্ষদ্বারাও অহিংসা সীমাবদ্ধ হইতে পারে; যেমন দেবতা ও ব্রাহ্মণার্থে ব্যতীত জীবহিংসা না করা; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সকল সময় হিংসাত্যাগ করা; আত্মরক্ষার্থে কিংবা পরপীড়ননিবারণার্থে ব্যতীত কখনও হিংসা না করা। তবে, যিনি যম-নিয়মাদি যোগসাধন করিবেন, তাঁহার পক্ষে জাতি, দেশ, কাল কিংবা সময়দ্বারা সীমাবদ্ধ না করিয়া, সর্ব্বতোভাবে অহিংসাব্রত পালন করা কর্ত্তব্য।

(২) সত্য—বাক্য এবং মন যথার্থ হইলে তাহাকে 'সত্য' বলে—যাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান কিংবা শ্রবণ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বোধ, মন

---

* "অহিংসা সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহঃ॥"

[যোগসূত্র-ব্যাসভাষ্যম্]

ও বাক্য এক হইলেই তাহাকে সত্য কহে। স্বীয়বোধ অপরকে জ্ঞাপন করিবার জন্যই বাক্য বলা হয়। তাহা যদি বঞ্চনা-নিমিত্তক বা ভ্রান্তি-উৎপাদক, অর্থাৎ শ্রোতার অযথার্থ-জ্ঞানোৎপাদক না হয়, আর যদি উহা সর্ব্বভূতের উপকারার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, জীবগণের অনিষ্টের নিমিত্ত না হয়, তবেই তাহাকে 'সত্য' বলা যায়।

(৩) অস্তেয়—কায়মনোবাক্যে পরদ্রব্যে স্পৃহা না করাকে 'অস্তেয়' কহে। *

(৪) ব্রহ্মচর্য্য—গুপ্ত ইন্দ্রিয় উপস্থের সংযমকে 'ব্রহ্মচর্য্য' কহে। † অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বত্র কায়মনোবাক্যে মৈথুনত্যাগের নাম 'ব্রহ্মচর্য্য'। ‡ মৈথুন অষ্টবিধ যথা—

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ স্পর্শনং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নির্ব্বৃত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচৈর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥"

অর্থ। কামভাবে স্ত্রীস্মরণ, তদ্বিষয়ে কীর্ত্তন বা কথোপকথন, তৎসহ ক্রীড়া, তাহার স্পর্শ, তাহার সহিত গোপনে আলাপ, মৈথুন-উপভোগের সংকল্প, সেই সংকল্প পূরণের জন্য অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি অর্থাৎ

* "অস্তেয়-নাম মনোবাক্-কায়কর্ম্মভিঃ পরদ্রব্যেষু নিঃস্পৃহা।"
[শাণ্ডিল্যোপনিষৎ]

† "ব্রহ্মচর্য্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্যোপস্থস্য সংযমঃ।"
[যোগসূত্র-ব্যাসভাষ্যম্]

‡ "ব্রহ্মচর্য্যং নাম সর্ব্বাবস্থাসু মনোবাক্-কায়কর্ম্মভিঃ সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগঃ।"
[শাণ্ডিল্যোপনিষৎ]

সঙ্গমদ্বারা বীর্য্যপাত, এই অষ্টপ্রকার মৈথুন বিজ্ঞব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন। ইহার বিপরীত অর্থাৎ ঐ সকল না করাই ব্রহ্মচর্য্য।

শিষ্য। গুরুদেব! যাঁহারা বিবাহিত তাঁহারা এরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে কিরূপে প্রজাপতির সৃষ্টিরক্ষা পাইবে?

গুরু। বৎস! যাঁহারা নৈষ্ঠিক অর্থাৎ আজীবন কুমার ব্রহ্মচারী, অথবা যাঁহারা নিয়তই অরণ্যবাসী, যাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহাদের জন্যই উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য বিহিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা গৃহস্থ অর্থাৎ বিবাহিত, তাঁহাদের জন্য শাস্ত্রে অন্যরূপ ব্রহ্মচর্য্যের বিধান আছে; বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"ঋতাবৃতৌ স্বদারেষু সঙ্গতির্যা বিধানতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং তদেবোক্তং গৃহস্থাশ্রমবাসিনাম্॥"

অর্থ। ঋতুকালে নিজ বনিতার সহিত শাস্ত্রোক্ত বিধানানুযায়ী যে সঙ্গম, তাহাই গৃহস্থাশ্রমবাসীদিগের ব্রহ্মচর্য্য। *

* পুত্রের জন্যই ভার্য্যাগ্রহণ, কামচরিতার্থ করিবার জন্য নহে। তাই পুত্র-কামী গৃহস্থ নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় বিধানমত প্রতি ঋতুকালে ভার্য্যাগমন করিতে পারে, তাহাতে তাহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না।

"অমাবস্যামষ্টমীঞ্চ পৌর্ণমাসীং চতুর্দ্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যমপ্যৃতৌ স্নাতকো দ্বিজঃ॥" [মনুসংহিতা]

অর্থ। স্নাতক দ্বিজ (সমাবর্ত্তনপ্রাপ্ত গৃহস্থ) ভার্য্যার ঋতুকালে এবং অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী এই সকল তিথিতে ব্রহ্মচারী হইয়া (অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া) থাকিবে।

"লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিং পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যাঃ ভর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥
ষোড়শস্তু নিশাঃ স্ত্রীণাং তাসু যুগ্মাসু সংবিশেৎ।
ব্রহ্মচার্য্যেব পর্ব্বাণ্যাদ্যাশ্চতস্রস্তু বর্জ্জয়েৎ॥

(৫) অপরিগ্রহ—বিষয়ের উপার্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, আসক্তি ও হিংসা-রূপ দোষসমূহ দর্শন করিয়া বিষয়পরিগ্রহ হইতে বিরত থাকার নাম 'অপরিগ্রহ'। *

নিয়ম-পঞ্চক।

(১) শৌচ—মৃত্তিকা ও জলাদিদ্বারা মার্জ্জন-জনিত শৌচ এবং পবিত্র আহার, এইগুলি বাহ্যশৌচ, আর চিত্তমল দূর করাকে আভ্যন্তরিক শৌচ কহে। † প্রাণায়ামাদিদ্বারা আভ্যন্তরিক শৌচ সাধিত হয়।

(২) সন্তোষ—ঈশ্বরেচ্ছায় বা প্রারব্ধবশতঃ যখন যাহা লব্ধ হয়, তাহাতেই সুখী থাকাকে 'সন্তোষ' কহে। ‡

এবং গচ্ছন্ স্ত্রিয়ং ক্ষামাং মঘাং মূলঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
শস্ত ইন্দৌ সকৃৎ পুত্রং লক্ষণ্যং জনয়েৎ পুমান্॥"

[যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা]

অর্থ। যেহেতু পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদিদ্বারা ইহলোকে বংশবিস্তার ও পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে অতএব পুত্রার্থে স্ত্রীদিগকে সেবা, ভরণপোষণ ও উত্তমরূপে রক্ষা করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের ঋতুকাল ষোড়শ রাত্রি; এতন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, এই সকল পর্ব্বদিন আর মঘা ও মূলা নক্ষত্র বর্জ্জন করিয়া, প্রশস্ত চন্দ্রে (অর্থাৎ চন্দ্রশুদ্ধি দেখিয়া) যুগ্ম (অর্থাৎ ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ, ১৪শ ও ১৬শ) রাত্রিতে, ব্রতক্ষীণা (ঋতুকালে আহারবিহারাদিতে সংযমাবলম্বিনী) স্ত্রীতে উপগত হইবে; তাহা হইলেই সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে।

* "বিষয়াণামর্জ্জন-রক্ষণ-ক্ষয়-সঙ্গ-হিংসাদোষদর্শনাদস্বীকরণমপরিগ্রহঃ।"

[যোগসূত্র-ব্যাসভাষ্যম্]

† "শৌচং মৃজ্জলাদিজনিতং মেধ্যাভ্যবহরণাদি চ বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চিত্তমলানামাক্ষালনম্।" [যোগসূত্র-ব্যাসভাষ্যম্]

‡ "সন্তোষো নাম যদৃচ্ছা-লাভ-সন্তুষ্টিঃ।" [শাণ্ডিল্যোপনিষৎ]

(৩) তপস্যা—দ্বন্দ্বসহনকে 'তপস্যা' বলে। দ্বন্দ্ব, যথা—ক্ষুধা-পিপাসা, শীত-গ্রীষ্ম, উঠা-বসা, কাষ্ঠমৌন (ইঙ্গিতদ্বারাও অভিপ্রায় প্রকাশ না করা) ও আকারমৌন (কেবল কথা না বলা), শাস্ত্রবিধিমত কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ ও সান্তপনাদি ব্রতানুষ্ঠান। * তপস্যাদ্বারা শরীর শোষণ করা হয়।

(৪) স্বাধ্যায়—মোক্ষশাস্ত্র (যথা গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, উপনিষদাদি) পাঠ অথবা প্রণবজপকে 'স্বাধ্যায়' বলে। † এখানে 'প্রণবজপ' শব্দে নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্র বুঝিয়া লইও।

(৫) ঈশ্বর-প্রণিধান—পরমগুরু পরমেশ্বরে বা পরমাত্মায় সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করাকে 'ঈশ্বর-প্রণিধান' কহে। ‡

শিষ্য। ভগবন্! ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ কি ভাবে করিব?

গুরু। সাধারণতঃ 'অহং কর্ত্তা' (আমি কর্ত্তা) এইরূপ অভিমান হইতেই কর্ম্ম হয়। 'আমি কর্ত্তা নহি, ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা—আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী' এইরূপ মনে করিয়া, কর্ম্মফলে স্পৃহা না রাখিয়া কর্ম্ম করিলেই ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ হয়। 'অহং কর্ত্তা'রূপ অভিমান রহিত হইলেই কর্ম্মফলেও স্পৃহা থাকে না; যেমন রাজসৈন্যেরা রাজ্যজয়ের জন্য যুদ্ধ করে বটে, কিন্তু রাজ্যপ্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে তাহাদের কোন প্রকার স্পৃহাই নাই, কারণ তাহাদের জানা আছে যে তাহারা রাজার আজ্ঞাবহ

* "তপঃ দ্বন্দ্বসহনম্, দ্বন্দ্বশ্চ জিঘৎসাপিপাসে, শীতোষ্ণে, স্থানাসনে, কাষ্ঠমৌনাকার-মৌনে চ, ব্রতানি চৈব যথাযোগং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণসান্তপনাদীনি।"

[যোগসূত্র-ব্যাসভাষ্যম্]

† "স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণব-জপো বা।" [ঐ]

‡ "ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরৌ সর্ব্বকর্ম্মার্পণম্।" [ঐ]

ভৃত্যমাত্র,—রাজ্যপ্রাপ্তি কিংবা অপ্রাপ্তি, জয় কিংবা পরাজয় সবই রাজার।

শিষ্য। প্রভো! এই অহিংসাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে কি ফললাভ হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি; কৃপাপূর্ব্বক তাহা সবিস্তারে বলুন।

গুরু। বৎস! অহিংসাদি প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের যে সকল সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা তোমাকে শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বলিতেছি।

পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে,—

(১) "অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।"

অর্থ। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের সম্বন্ধে অন্য সকল প্রাণীর হিংসাবুদ্ধি দূরীভূত হয়।

(২) "সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।"

অর্থ। সত্যপ্রতিষ্ঠিত হইলে ক্রিয়াফলদানের শক্তি জন্মে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সাধকের সত্যপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি যদি কাহাকেও বলেন 'তুমি ধার্ম্মিক হও', তবে সে ধার্ম্মিক হইবেই; যদি বলেন 'স্বর্গলাভ কর', তবে তাহার স্বর্গলাভ হয়; তিনি যদি কাহারও আরোগ্য বা মঙ্গলকামনায় কোন ক্রিয়া করেন, তবে তাহা সফল হইবেই। সত্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সংকল্প ও বাক্য অব্যর্থ হয়।

(৩) "অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বরত্নোপস্থানম্।"

অর্থ। সাধকের অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকট সর্ব্বদেশস্থ রত্নসমূহ উপস্থিত হয়।

(৪) "ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"

অর্থ। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের বীর্য্যলাভ হয়। বীর্য্য-লাভ হইলেই সাধনার অনুকূল গুণসমূহ বাধাশূন্য হইয়া পরমোৎকর্ষ

প্রাপ্ত হয়, এবং সিদ্ধি (আত্মজ্ঞান) লাভ হয়, তখন বিনীত ব্যক্তি-দিগের প্রতি জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চার করিবার সামর্থ্য জন্মে।

(৫) "অপরিগ্রহস্থৈর্য্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ।"

অর্থ। অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে জন্মের বৃত্তান্ত বিষয়ে জ্ঞান জন্মে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, 'আমি পূর্ব্বজন্মে কে ছিলাম, কি প্রকার ছিলাম; এই জন্মই বা কিরূপ, কেনই বা এই জন্ম হইল; ভবিষ্যৎ জন্মে কি হইব, কি নিমিত্তই বা হইব? এইরূপে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা এবং তাহার মীমাংসাও যথাযথরূপে উদিত হয়।

বৎস! যম প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সকল ফল সাধকের নিকট উপস্থিত হয়।

এখন, নিয়মপ্রতিষ্ঠাদ্বারা যে সমস্ত সিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহাও পাতঞ্জল যোগসূত্র হইতেই বলিতেছি।

(১) "শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।"

অর্থ। শৌচপ্রতিষ্ঠিত হইলে নিজ অঙ্গসমূহের প্রতি ঘৃণা জন্মে এবং পরদেহসংসর্গেরও অনিচ্ছা হয়।

জল ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যহ নিজশরীর মার্জ্জনপ্রক্ষালনাদি করিয়াও, যখন দেখা যায় যে, নিজদেহেরই শুদ্ধি সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত হয় না, তখন কি প্রকারে শৌচপ্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ শুচিশীল) ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত অশুচি পরশরীরের সংসর্গাভিলাষ হইতে পারে? শুচি-ব্যক্তির সত্ত্বশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ রজঃ ও তমোরাশি দূর হওয়ায় চিত্ত নির্ম্মলতা লাভ করে; তাহাতে মনের প্রসন্নতা ও একাগ্রতা জন্মে এবং ইন্দ্রিয়-জয় হয়। অনন্তর বুদ্ধিসত্ত্বে অর্থাৎ শুদ্ধচিত্তে আত্মদর্শনলাভের যোগ্যতা জন্মে।

(২) "সন্তোষাদনুত্তমস্সুখলাভঃ।"

অর্থ। সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুপম সুখ লাভ হয়।

তৃষ্ণা বা আশারাহিত্যই পরম সন্তোষ। ইহার তুল্য সুখ নাই ; এই সুখের তুলনায় স্বর্গাদি সুখও তুচ্ছ। শাস্ত্রান্তরেও আছে—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"

অর্থ। এই লোকে যে কাম্যসুখ আছে এবং স্বর্গে যে মহৎ সুখ আছে, এই সব (অর্থাৎ কি ঐহিক ভোগসুখ কি স্বর্গভোগসুখ, এতদুভয়), তৃষ্ণাক্ষয় (আশারাহিত্য)-জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে।

(৩) "কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াৎ তপসঃ।"

অর্থ। তপস্যা প্রতিষ্ঠিত হইলে দেহ ও চিত্তের অশুদ্ধি ক্ষয় হয় এবং তাহা হইতে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধিলাভ হয়।

তপস্যাদ্বারা কায়শোষণ হয় এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধি আবরণরূপ মলসমূহ নাশপ্রাপ্ত হয়। এই মল অপসারিত হইলে দেহসম্বন্ধীয় অণিমাদি সিদ্ধিসমূহ এবং দূরশ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয় সিদ্ধিসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে।

(৪) "স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।"

অর্থ। স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবতার উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার হয়।

এমন কি, দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণও স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয়েন এবং তাঁহারা তাঁহার সাধনায় সহায় হইয়া থাকেন অর্থাৎ ইষ্টদেবতালাভের সাহায্য করিয়া থাকেন।

(৫) "সমাধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।"

অর্থ। ঈশ্বরপ্রণিধান হইতে সমাধিলাভ হয়।

যিনি ঈশ্বরে যাবতীয় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া অনন্যচিত্ত হইয়াছেন, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল ও একাগ্র হওয়ায় অবিলম্বেই তাঁহার সমাধিলাভ হয়—তিনি ঈশ্বরভাবে মগ্ন হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন—তিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শনহেতু পরম শান্তিতে অবস্থান করেন।

পঞ্চম বিবৃতি।

শিষ্য। এখন, কি উপায়ে যোগসিদ্ধি হইতে পারে, তাহা আমাকে কৃপাপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! সংসারদাবানলে দগ্ধ ব্যক্তি শান্তিপিপাসু হইয়া প্রথমতঃ জ্ঞানবান্ যোগী-গুরুর নিকট উপঢৌকনাদি হস্তে লইয়া উপস্থিত হইবে এবং লজ্জা না করিয়া শ্রীগুরুর চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। যিনি প্রযত্নসহকারে গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে যোগসাধন করেন তিনি অল্পসময়মধ্যেই সেই সাধনার ফল প্রাপ্ত হন। জ্ঞানদাতা গুরুই পিতৃস্বরূপ, গুরুই মাতৃস্বরূপ এবং গুরুই দেবতাস্বরূপ; এই নিমিত্ত সাধকগণ কায়মনোবাক্যে এবং সর্ব্বতোভাবে গুরুসেবা করিয়া থাকেন। গুরু যদি প্রসন্ন হন, তাহা হইলে সমস্ত শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সর্ব্বদা গুরুসেবা করা কর্ত্তব্য। গুরুসেবা ভিন্ন শুভ ফল প্রত্যাশা করা বৃথা। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং ইতিহাসাদিতেও গুরুসেবার কথা ভূয়োভূয়ঃ কথিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি বিষয়ে আসক্তচিত্ত, যে সর্ব্বদা বহুলোকের সহবাস করে, যে মিথ্যা ব্যবহারে নিরত, যে অসত্য ও নিষ্ঠুর বাক্য কহে, যে অবিশ্বাসী ও গুরুপূজাবিহীন, যে গুরুর সন্তোষসাধনে যত্নবান্ নহে, তাহার কোনক্রমেই যোগসিদ্ধি হয় না।

'গুরুর নিকটে আমি যে যোগপথ পাইয়াছি, তদ্দ্বারা নিশ্চিতই সিদ্ধিলাভ হইবে' এইরূপ বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ; সিদ্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস; তৃতীয় লক্ষণ গুরুপূজা; চতুর্থ লক্ষণ সমতাভাব (সর্ব্বত্র সমদর্শন); পঞ্চম লক্ষণ ইন্দ্রিয়সংযম;

ষষ্ঠ লক্ষণ পরিমিত আহার। এতদ্ব্যতীত যোগসিদ্ধির সপ্তম লক্ষণ আর কিছুই নাই।

যোগসাধনাকালে অম্লদ্রব্য, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি রসহীন বা রুক্ষদ্রব্য, মরিচাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য, কটু অর্থাৎ নিম্বাদি অতি তিক্তদ্রব্য, অপক্ক লবণ, সর্ষপ বা সর্ষপতৈল প্রভৃতি যোগবিঘ্নকর খাদ্য আহার করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। অম্লের মধ্যে কাগজী ও কমলা লেবু খাওয়া যাইতে পারে। যোগসাধকের পক্ষে বহুপথভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, উপবাস, অঙ্গে তৈলব্যবহার, অগ্নিসেবা, মৈথুনকর্ম্ম, বাচালতা বা বহুবাক্যপ্রয়োগ, অতিভোজন ও প্রিয়াপ্রিয় বিচার, এতৎসমূহ পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিষ্য। দেব! যাহাদের একাদশী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে উপবাস করার সংস্কার আছে, তাহাদের পক্ষে কি করা উচিত? এবং যাহারা বিবাহিত জীবনে যোগপথ লাভ করিয়াছে তাহারা স্ত্রীসহবাস না করিলেই বা প্রজাপতির সৃষ্টিরক্ষা হইবে কিরূপে? তাহাদের পক্ষেই বা কি করা উচিত?

গুরু। বৎস! যাহারা যোগসাধন করিবে তাহাদের পক্ষে উপবাসাদি দেহপীড়াদায়ক কর্ম্ম করা বিধেয় নহে, কারণ তাহাতে সাধনার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে শরীরে সাধারণতঃ রসের আধিক্য হয়; ঐ সকল তিথিতে উপবাস করিলে ঐ রস-সঞ্চয় নিবারিত হয় বলিয়াই শাস্ত্রে উপবাসের বিধান আছে বটে; কিন্তু যোগীরা উপবাস না করিলেও, প্রাণায়ামাদিদ্বারাই তাহাদের শরীরের রসবাতাদি দূরীভূত হয়। যোগসাধকদিগের শরীর সাধারণতঃই বায়ুপ্রধান হয়, সুতরাং উপবাসাদি-দ্বারা তাহাদিগের শরীর রুক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা। এইজন্যই যোগশাস্ত্রে

উপবাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। একাদশী, জন্মাষ্টমী, শিবচতুর্দ্দশী প্রভৃতি উপলক্ষে উপবাস করা শারীরিক তপস্যার মধ্যে পরিগণিত বটে, কিন্তু প্রাণায়ামের তুল্য শ্রেষ্ঠ তপস্যা নাই। পাতঞ্জল-যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে—

"তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ, ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।"

অর্থ। প্রাণায়াম হইতে শ্রেষ্ঠতর তপস্যা নাই, তদ্দ্বারা শরীর ও মনের মল বিধৌত এবং জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

তপস্যার উদ্দেশ্য পাপ নষ্ট করা। পাপই ময়লা। একমাত্র প্রাণায়ামদ্বারাই সর্ব্বপ্রকার পাপ বা ময়লা নাশপ্রাপ্ত হয় এবং চিত্ত-শুদ্ধি ও সমাধিলাভ হইয়া থাকে। বৎস! এক কর্ম্মদ্বারাই যদি সকল ফল লাভ করিবার সুবিধা পাওয়া যায়, তবে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্যান্য কর্ম্ম করার আবশ্যকতা কি? তবে, যাহাদের এই সকল উপবাসাদিতে তীব্র সংস্কার আছে, তাহাদের পক্ষে, যোগসাধন করিতে হইলে, নিরম্বু উপবাস না করিয়া ফলমূলাদি আহার ও দুগ্ধাদি পান করা কর্ত্তব্য। যাহারা যোগমার্গে প্রবৃত্ত হয় নাই; তাহাদের পক্ষে এই সকল উপ-বাসাদিরূপ তপস্যা করা মন্দ নহে।

তোমার অপর প্রশ্নটীর উত্তর এই যে, যাহারা বিবাহিত, তাহারা পুত্রার্থে ঋতুকালে যথাশাস্ত্র ভার্য্যাগমন করিতে পারে, তাহাতে তাহা-দিগের ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না। এবিষয়ে, পূর্ব্বে তোমাকে বিশদরূপে বলিয়াছি। সুতরাং এখন আবার তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। যোগ-সাধন করিতে হইলে বিন্দুরক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। অতিরিক্ত মৈথুনদ্বারা বিন্দু নষ্ট হইয়া যায়। বিন্দু নষ্ট হইলে প্রাণের চঞ্চলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ চঞ্চল হইলেই মনও চঞ্চল হয়। তখন আর

মনকে নিগ্রহ করার সামর্থ্য থাকে না। মস্তিষ্কের প্রধান শক্তিই ওজঃশক্তি। বিন্দুক্ষয়ে এই ওজঃশক্তি নষ্ট হওয়ায় নানাপ্রকার স্নায়বিক ব্যাধিদ্বারা শরীর আক্রান্ত হয় এবং অকালে মৃত্যু ঘটে। বিন্দু হইতে প্রাণিগণ জন্মগ্রহণ করে এবং বিন্দুক্ষয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শিব-সংহিতায় আছে—

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং॥"

অর্থ। বিন্দুপাতদ্বারা মরণ এবং বিন্দুধারণদ্বারা জীবনরক্ষা হয়। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে বিন্দুধারণ করিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! সাধকের পক্ষে কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করা উচিত এবং অপথ্যই বা কি, তাহা বলুন।

গুরু। বৎস! যোগসাধকের পথ্যাপথ্য বলিতেছি শ্রবণ কর। পথ্য যথা,—শালিধান্যের অন্ন, যবচূর্ণ (যবের ছাতু), গোধূমচূর্ণ (ময়দা বা আটা), মুদ্গ (মুগের ডাল), মাষকলাই, চণক (ছোলা); এই সকল শস্য তুষশূন্য ও শ্বেতবর্ণ হওয়া আবশ্যক। পটোল, পনস (কাঁচা কাঁটাল), মানকচু, কক্কোল, বদরী (কুল), করঞ্জ (করম্‌চা), কাঁকুড়, ডুমুর, কাঁচকলা, বালরম্ভা (ঠুঁটে কলা), রম্ভাদণ্ড (থোড়), মোচা, মূলা, বার্ত্তাকু (বেগুন), এই সমস্ত তরকারী। শাকের মধ্যে পল্‌তা, বেতোশাক, হিলমোচিকা (হিঞ্চে), পুনর্ণবা শাক, কালশাক, নটিয়া শাক ও পালং শাক খাওয়া যায়; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটী শাকই শ্রেষ্ঠ। যোগারম্ভসময়ে ঘৃত ও দুগ্ধ ব্যবহার করা উচিত। দুগ্ধ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে শরীরে রসবৃদ্ধি হইতে পারে। একজনের পক্ষে একবেলায় আধ সের দুগ্ধই যথেষ্ট। রাত্রে দুগ্ধপান করা ভাল নহে।

যে সকল বস্তু আহার করিলে সহজে পরিপাক হয় ও যদ্দ্বারা ধাতুর পুষ্টি সাধিত হয়, যাহা স্নিগ্ধ ও প্রীতিজনক, তাদৃশ মনোনীত দ্রব্য আহার করাই যোগীর কর্ত্তব্য। যে সকল বস্তু কঠিন, যাহা আহার করিলে পাতকসঞ্চয় হয়, যাহা দুর্গন্ধযুক্ত (যেমন পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি), যাহা অতি উষ্ণ বা অতি শীতল, পর্য্যুষিত (বাসি অর্থাৎ পূর্ব্বদিনে পক্ব) ও উগ্র, এমন খাদ্য আহার করা বিধেয় নহে। গুরুভিন্ন অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট আহার করা উচিত নহে। গৃহীর পক্ষে মাতা, পিতা ও দীক্ষাদাতা, এই তিনজনকেই গুরু মনে করিবে। তবে, জ্ঞানদাতা বলিয়া গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শক্তিসঞ্চারক ও জ্ঞানদাতা গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে ও পাদোদক পানে শক্তি বর্দ্ধিতই হইবে। যাঁহার ইচ্ছায় তোমার মধ্যে এক আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাঁহার দেহটী একটী শক্তিরাশির কেন্দ্র, মনে রাখিও। দেহযন্ত্রের অঙ্গুলিই শক্তি-সঞ্চারের প্রধান দ্বার। গুরু যে সকল জিনিষ ব্যবহার করেন ও আহার করেন, তাহাতে তাঁহার শরীর হইতে অঙ্গুলিযোগে একটী বিশুদ্ধ তাড়িৎশক্তি সঞ্চারিত হয়। এই জন্যই গুরুর ভোজনাবশিষ্ট ও পাদোদক গ্রহণের বিধি। শ্রীজাবালোপনিষদে আছে,—

"জ্ঞানযোগপরাণাং তু পাদপ্রক্ষালিতং জলম্।
ভাবশুদ্ধ্যর্থমজ্ঞানাং তত্তীর্থং মুনিপুঙ্গব॥"

অর্থ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! জ্ঞানীদিগের পাদপ্রক্ষালিত জল অজ্ঞানী-দিগের ভাবশুদ্ধিকারক, এইজন্য তাহা তীর্থস্বরূপ।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিজ পতিও পরম গুরু, এবং শ্বশুর ও শাশুড়ী গুরুর গুরু; এইজন্য তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদোদক পান বধূ-দিগের পক্ষে প্রশস্ত।

শিষ্য। ভগবন্! আপনার উপদেশে বুঝিতে পারিলাম যে,

রাজসিক ও তামসিক আহার বর্জ্জন করিয়া সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করাই যোগীদিগের কর্ত্তব্য। এখন আমিষ আহার সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বৎস! যোগীদিগের পক্ষে সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করাই যখন কর্ত্তব্য, তখন সাধারণতঃ আমিষাহার পরিত্যাগ করাই প্রশস্ত; কারণ আমিষাহার রজঃ ও তমোগুণই বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তবে, শরীররক্ষার্থ—আরোগ্যের নিমিত্ত, যদি কখনও চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে আমিষ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়, তবে যথাবিধান তাহা আহার করা যাইতে পারে।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।"

(ধর্ম্ম বল, অর্থ বল, কাম বল, মোক্ষ বল, উত্তম আরোগ্যই, সকলের মূল—শরীর ও মন নীরোগ বা সুস্থ না থাকিলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই সাধিত হইতে পারে না)।

অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে স্বাস্থ্যরক্ষা কর্ত্তব্য, এবং এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসকের উপদেশানুসারে আমিষাহার করা যাইতে পারে; কিন্তু রসনার তৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে কখনও আমিষাহার বিধেয় নহে। কেবল আমিষ বলিয়া নহে, মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি লোভে পড়িয়া কোন খাদ্যই গ্রহণ করিবেন না; সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য হইবে। বিশেষতঃ আমিষ আহার করিতে হইলেই জীবহিংসা করিতে হয়, ইহাও বিবেচ্য বিষয় বটে। তবে, একজন সাধু পুরুষের জীবনরক্ষাদ্বারা জগতের অধিকতর মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, কেবল এই বিচারেই সাধুজনের জীবনরক্ষা ও আরোগ্যার্থ আমিষাহার বিহিত মনে করা যাইতে পারে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি ত অতিভোজন নিষেধ করিয়াছেন;

আমাদের ত চির অভ্যাস বারুদঠাসার মত আহার করা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এবিষয়ে কোন নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায় না কি ?

গুরু। বৎস! পরিমিত আহারই যোগীদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। ঘেরণ্ডসংহিতায় আছে,—

"মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভন্তু কারয়েৎ।
নানারোগো ভবেত্তস্য কিঞ্চিদ্‌যোগো ন সিধ্যতি॥"

অর্থ। যে ব্যক্তি পরিমিত আহার অবলম্বন না করিয়া যোগারম্ভ করে, তাহাকে নানাপ্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয়, এবং তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যোগসিদ্ধি হয় না।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও আছে,—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥"

অর্থ। যিনি অত্যধিক আহার করেন তাঁহার যোগ হয় না, আবার যিনি একান্ত অনাহারী তাঁহারও যোগ হয় না; অতি নিদ্রালুব্যক্তিরও যোগ হয় না এবং অতি জাগরণশীলেরও যোগ হয় না।

হে পুত্র! কিরূপ আহারাদি করিলে যোগসিদ্ধি লাভ করা যায়, তদ্বিষয়ে ঐ গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ কর।—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

অর্থ। যিনি পরিমিত আহারবিহারশীল, কর্ম্মসকলে পরিমিত-চেষ্টাশীল এবং পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল, তাঁহারই যোগ দুঃখ-নিবারক হয়।

শিষ্য। পরিমিত আহার কিরূপ তাহা আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন। নানাপ্রকার প্রশ্নদ্বারা আমি আপনাকে কতই বিরক্ত করি-

তেছি। সাধনার পথে আমরা অজ্ঞ বলিয়াই অতি সামান্য বিষয়েও জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

গুরু। না পুত্র! তোমার এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া আমি বিন্দুমাত্রও বিরক্ত নহি; বরং তোমার যোগবিষয়ক কৌতূহল দেখিয়া আমি আনন্দিত হইতেছি। অতি সামান্য বিষয়েও তোমার সংশয় উপস্থিত হইলে বা জানিতে ইচ্ছা হইলে অসঙ্কোচে আমাকে বলিবে। মনের যাবতীয় সংশয় দূর করিবার জন্যই ত গুরু! আমাদের পরিধেয় বসনাদি মলিন হইলে যেমন রজকের নিকট উপস্থিত করি এবং রজক ক্ষারাদি-দ্বারা তাহা পরিষ্কার করিয়া দেয়, তদ্রূপ মনে সংশয় উপস্থিত হইলেই গুরুর নিকট বলা উচিত; কারণ গুরু উপদেশরূপ ক্ষারদ্বারা মনের সংশয়রূপ ময়লা দূর করিয়া দিবেন।

এখন মিতাহার বিষয়ে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। নির্ম্মল, সুমধুর, স্নিগ্ধ ও সুরস বস্তুসমূহ নিজ ইষ্টদেবকে মনে মনে নিবেদন করিয়া সন্তোষসহকারে তাহা আহারদ্বারা অর্দ্ধোদর ও জলদ্বারা উদরের এক চতুর্থাংশ পূর্ণ করিবে, এবং বাকী চতুর্থাংশ বায়ুচালনার্থ শূন্য রাখিতে হইবে। ইহাকেই মিতাহার কহে। মিতাহার সম্বন্ধে এই একটী সহজ কথা মনে রাখিবে যে, আহারাদি শেষ হইয়া গেলেও যেন পেট কিছু খালি আছে এবং আরও কিছু স্বচ্ছন্দে খাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়, এইভাবে আহার করা বিধেয়। সাধকের পক্ষে পেট ভরিয়া খাওয়া সঙ্গত নহে, কারণ তাহাতে শরীরে জড়তা ও অলসতা বৃদ্ধি পায়। বৎস! ক্ষুধা হইলে বরং অল্প অল্প কিছু খাইতে পার, তথাপি একবারে বেশী খাওয়া যোগীর পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ। স্মরণ রাখিও, আহার করিবার অব্যবহিত পরে এবং অত্যন্ত ক্ষুধার সময় যোগসাধনা করিবে না। তবে, অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করিলে অতি সামান্য

কিছু খাইয়া সাধনা করিতে পার। ক্ষুধার সময় সাধনা করিলে চিত্ত স্থির হয় না, কেবল বিঘ্নই জন্মে। কবীর বলিয়াছেন,—

"কবীর ক্ষুধা-কুকুরী করত ভজনমে ভঙ্গ।
য়্যাকো টুক্‌রা ডার কর সুমিরণ করো নিঃশঙ্ক॥"

অর্থ। কবীর বলেন, ক্ষুধা-কুকুরী ভজন সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাকে এক টুক্‌রা খাদ্যপ্রদানপূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার (ঈশ্বরের) স্মরণ মননাদিতে মগ্ন হও।

হে বৎস! যে সময় পিঙ্গলা নাড়ীতে অর্থাৎ দক্ষিণ নাসাতে শ্বাস প্রবাহিত হইবে, সেই সময় যোগীর আহার করা কর্ত্তব্য, কারণ পিঙ্গলা নাড়ীকে সূর্য্যনাড়ীও কহে। যখন এই নাড়ীতে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়, তখন এই দেহরূপ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের দিবা। ইড়া নাড়ীই চন্দ্র নাড়ী; যখন প্রাণবায়ু এই নাড়ীতে প্রবাহিত হয়, তখন এই দেহরূপ ক্ষুদ্র-ব্রহ্মাণ্ডের রাত্রি। দিবাতে অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ুবহন-সময়ে আহার করিলে শরীরে রস উৎপন্ন হইতে পারে না, বরং সহজে হজম হইয়া যায়। রাত্রিতে অর্থাৎ ইড়ানাড়ীতে বায়ুবহনসময়ে আহার করিলে সহজে হজম হয় না, বরং ইহাতে শরীরে রসের সঞ্চার হইতে পারে।

শিষ্য। আহার-সময়ে যদি দক্ষিণ নাসায় শ্বাস না বহে, তবে কি করা কর্ত্তব্য?

গুরু। আহারের পূর্ব্বেই দেখিবে, তোমার কোন্ নাসিকায় শ্বাস বহিতেছে। যদি বাম নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তবে বাম বগলে একটা বালিস দিয়া বাম কাৎ হইয়া শুইয়া থাকিবে এবং বাম নাসাদ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ নাসাদ্বারা ত্যাগ করিবে, কিছুক্ষণ পরে দেখিতে পাইবে যে, তোমার দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহিতেছে। অথবা বাম পদের উরু সরলভাবে রাখিয়া দক্ষিণ উরু ভূমিতে পাতিয়া রাখিবে

ও বাম বগলদ্বারা বাম হাঁটু বেষ্টনপূর্ব্বক বাম করতল বাম পদতলের নিম্নে স্থাপন করিয়া সেই দিকে চাপিয়া বসিবে, এবং বাম নাসিকাদ্বারা বায়ুগ্রহণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকাদ্বারা ধীরে ধীরে ত্যাগ করিবে। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিলে দক্ষিণ নাসায় বায়ু বহিতে থাকিবে, এবং যাহাতে পুনরায় সহসা বাম নাসায় বায়ুপ্রবাহ চলিয়া না যায়, সেইজন্য ঐরূপ আসনে বসিয়াই আহার করিবে। তবে আহারে বসিবার জন্য বিশেষ তাড়া না পড়িলে, যাবৎ বিনা যত্নে সরলভাবে দক্ষিণ নাসায় শ্বাস না বহিতে থাকে তাবৎ আহারে না বসাই ভাল।

শিষ্য। গুরুদেব আপনি এযাবৎ যে আহারাদির নিয়মের কথা বলিলেন, তাহা কত দিন পালন করিতে হইবে?

গুরু। বৎস! যোগী আর রোগী প্রায় সমান। যেমন রোগী শারীরিক রোগগ্রস্ত হইয়া চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হয় এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপিত ঔষধপথ্যাদির ব্যবহারদ্বারা আরোগ্যলাভ করিলে আর তাহার ঐ ঔষধপথ্যের প্রয়োজন হয় না; সেইরূপ যাঁহারা ভবরোগে কাতর হইয়া গুরু-বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হন তাঁহাদেরও আরোগ্যলাভ না করা পর্য্যন্ত গুরূপদেশ মত সাধনা এবং বিধিনিষেধাদি পালন করিতে হইবে। নিয়মপালনসহকারে সাধনাদ্বারা, বিক্ষিপ্ত মন, বৃত্তিনিরোধহেতু, আত্মসমাহিত হইলে এবং সর্ব্ববস্তুতে এক অখণ্ড চৈতন্যের অনুভূতি হইতে থাকিলে আর বিশেষ নিয়মপালনের আবশ্যকতা হয় না। যেমন, মেষ, ছাগ, গো মহিষাদি পশুগণ হইতে চারা গাছকে রক্ষা করিবার জন্য বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হয় কিন্তু সেই চারা গাছ বৃক্ষে পরিণত হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না বা পশ্বাদি হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না, বরং তখন ঐ বৃক্ষে প্রকাণ্ড হস্তীকেও বাঁধিয়া রাখা যায়, তেমনই যাবৎকাল যোগদ্বারা দেহ, মন,

বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহের অতীত চৈতন্যস্বরূপ আত্মার প্রত্যক্ষোপলব্ধিদ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় না জন্মিবে তাবৎ এই নিয়মসমূহ অতি যত্নের সহিত পালন করিতে হইবে, নতুবা সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত থাকিবে। বাবা, যাঁহারা এই জীবনেই যোগজজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ যাঁহারা সাধক, তাঁহাদের জন্যই এই সব আচার নিয়মের বিধান, যাঁহারা যোগজ জ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য নহে; আর যাহারা তমসাচ্ছন্ন—মোহে আচ্ছন্ন হইয়া 'বেশ আছি' মনে করিতেছে, তাহাদের জন্যও নহে।

ষষ্ঠ বিবৃতি

শিষ্য। গুরুদেব! কিরূপ স্থানে কিরূপ আসনে এবং কোন্ কোন্ সময় সাধনা করা প্রয়োজন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি কৃপা-পূর্ব্বক তাহা আমাকে বলিয়া দিন। এখন আপনার উপদেশমত সাধন করিয়া আত্মস্থ হইতে পারিলেই জীবন ধন্য মনে করিব।

গুরু। বৎস! বাড়ীর অন্যান্য গৃহ হইতে সাধনগৃহ পৃথক্ থাকাই ভাল। ঐ মন্দিরে বৈষয়িক আলাপাদি (অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরতত্ত্ব নাই এমন আলাপাদি) করিবে না, কারণ তাহাতে গৃহের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। এইজন্যই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঠাকুরঘর বা উপাসনা-মন্দির পৃথক্ রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সাধনার মন্দির গোময়দ্বারা লেপন করিবে এবং তাহাতে ধূপধূনাদি জ্বালাইবে; তাহাতে গৃহস্থিত দূষিত বায়ু নষ্ট হইবে এবং মনেরও প্রফুল্লতা জন্মিবে। ঐ গৃহ নিজ গুরুদেবের এবং বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, তৈলঙ্গস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মুক্ত মহাপুরুষদিগের ফটো বা চিত্রদ্বারা সজ্জিত করিবে। এইরূপ সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের চিত্র দর্শন করিলে, ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহাদের আগ্রহ, ত্যাগ ও বৈরাগ্যাদির বিষয় স্মরণ হয়, তাহাতে মনে সাধনার জন্য প্রবল উৎসাহ জন্মে। এমন কি এই সকল মহাত্মা-দিগের বৈরাগ্যযুক্ত ভাবের মধ্যে মগ্ন হইতে পারিলেও চিত্ত স্থির হয়। পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে—

"বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।"

অর্থ। যাঁহাদের চিত্ত বীতরাগ, অর্থাৎ যাঁহারা সংসারাসক্তিশূন্য

মুক্ত মহাপুরুষ, তাঁহাদের বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে সমাহিত হইলেও, চিত্ত-স্থিতিপদ লাভ করে।

বৎস! সাধনগৃহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নশীল হইবে। কিছুকাল সেইরূপ করিলেই তাহার উপকারিতা বেশ বুঝিতে পারিবে। দেখ, ঠাকুরঘরের পবিত্রতা রক্ষিত হইলে, এবং তাহাতে ঠাকুরপূজা ও ধ্যানাদি ব্যতীত কোন বৈষয়িক কার্য্য বা আলাপাদি না হইলে, ঐ ঘর এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ হয় যে, তাহাতে প্রবেশ করিলেই ঠাকুরের ভাবে মন অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে; সাধনঘরের পবিত্রতা রক্ষা করিলে তাহাও এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ হইবে যে, মানসিক চঞ্চলতা বা দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইলে, সাধনঘরে প্রবেশমাত্রই আপনা আপনি নামপ্রবাহ চলিতে থাকিবে এবং অচিরে সকল চঞ্চলতা ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া চিত্ত প্রসন্ন ও শান্ত হইবে। যেস্থানে বসিয়া যোগী যোগসাধন বা ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করেন, সেই স্থান তাঁহার দেহস্থ সুনির্ম্মল তড়িৎপ্রবাহ-সংস্পর্শে পবিত্রভাব ধারণ করে। এইজন্যই বহুদিন পরে সেই স্থান অপর অজ্ঞান মানবদিগের পক্ষে তীর্থস্থানস্বরূপ হয়। আমাদিগের তীর্থস্থানগুলি জীবন্মুক্ত ঋষি-দিগের তপস্যাস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শিষ্য। গুরুদেব, যাহাঁদের স্বতন্ত্র সাধনঘর নাই, কিংবা সত্বর প্রস্তুত করিয়া লইবারও সামর্থ্য নাই, তাহাদের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য?

গুরু। বৎস, তাহারা নিজ নিজ সুবিধামত স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইবে এবং সাধনাকালে অন্য কাহাকেও সেই ঘরে যাইতে দিবে না। সেখানে গুরুদেবের ফটো ও চিত্রাদি রাখিলে এবং সাধনে বসিবার পূর্ব্বে ধূপধূনাদি দিতে পারিলে ভাল হয়। একাকী সাধনগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করিবে।

বৎস, এখন কিরূপ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক সাধনা করিবে তাহা বলিতেছি। ভূমিতে কুশাসন (তদভাবে তৃণনির্ম্মিত মাদুর), তদুপরি মৃগচর্ম্ম এবং তদুপরি বস্ত্রাসন পাতিবে। আসনটী যেন অতি উচ্চ কিংবা অতি নিম্ন না হয়। যে আসনে বসিয়া সাধনা করিবে তাহাতে অন্য কাহাকেও বসিতে দিবে না এবং ঐ আসনে বসিয়া সাধনা ও মোক্ষশাস্ত্রাদি আলোচনা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য বা কাহারও সঙ্গে বৈষয়িক আলাপাদি করিবে না। এরূপ বিধি পালন করিলে আসনের পবিত্রতা রক্ষা হইবে।

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও গভীর রাত্রি এই সকল সময়ে সাধনা করিবে। এই চারি সময়ই সাধনার প্রশস্ত কাল। এই চারি সময়ে সাধনার অভ্যাস করিলে, কিছুকাল পরে বুঝিতে পারিবে যেন নাম-প্রবাহ তোমার শরীরমধ্যে ঘড়ির কাঁটার ন্যায় অনবরত আপনা আপনিই চলিতেছে। তখন দেখিতে পাইবে যে, সর্ব্বদা ৺ভগবানের নাম স্মরণ না থাকিলেও এবং তুমি বিষয়ান্তরে লিপ্ত থাকিলেও, ঐ ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার অভ্যাসই তোমাকে নাম স্মরণ করাইয়া দিবে, আর সেই নামশক্তি তোমাকে প্রবলভাবে সাধনার দিকে টানিতে থাকিবে; তুমিও তখন সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেই শান্তি ও আনন্দ পাইবে। নবীন সাধকদিগের পক্ষে এই চারি সময়ে সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে, যাহারা সাংসারিক কাজের জন্য মধ্যাহ্নে সাধনায় বসিতে পারিবে না, তাহারা অগত্যা তিনবারই সাধন করিবে।

শিষ্য। বাবা! আপনি যেরূপ পবিত্র স্থান ও আসনের কথা বলিলেন ৺শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে তদ্রূপ স্থান ও আসনের কথা বলিয়াছেন; গীতায় আছে—

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরং॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥"

অর্থ। অতি উচ্চও নয়, অতি নিম্নও নয়, এইরূপ একখানি স্থির আসন পবিত্র স্থানে স্থাপন করিবে—প্রথমে একখানি কুশাসন, তদুপরি মৃগচর্ম্ম ও তদুপরি বস্ত্র পাতিবে। এইরূপে আসন রচনাপূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করিয়া সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে সংযত করিবে এবং জিতেন্দ্রিয় ও বিজিতচিত্ত হইয়া অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য যোগাভ্যাস করিবে।

গুরুদেব, শ্রীভগবান্ কুশাসন ও মৃগচর্ম্মাদির কথা কেন বলিলেন তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমার বোধ হয়, ইহাতে কোন বিজ্ঞান নিহিত আছে।

গুরু। হাঁ, বৎস! ইহাতে বিজ্ঞান নিহিত আছে বৈ কি। সাধনার সময় মনঃসংযমহেতু সাধকের শরীরে তড়িৎপ্রবাহ হইতে থাকে। পৃথিবী ও ধাতুসকল তড়িৎ-পরিচালক এবং কুশাসন ও মৃগচর্ম্মাদি তড়িৎ-প্রবাহ-নিবর্ত্তক। শরীরের তড়িৎ বাহির হইয়া গেলে শরীরের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়। এইজন্য তড়িৎ-প্রবাহ-নিবর্ত্তক কুশাসনাদির ব্যবস্থা। কেবল মৃত্তিকার উপর কিম্বা লৌহাদি ধাতুময় স্থানের উপর বসিয়া সাধনা করা নিষিদ্ধ।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশ শুনিয়া মনে হইতেছে যে, আমাদের আর্য্যঋষিগণ যে সকল বিধি করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদয় বিজ্ঞানসম্মত। আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, তাই ঋষিদিগের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহাদের ব্যবস্থায় দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের প্রমাণ না পাওয়া

পর্য্যন্ত আমাদের শাস্ত্রবাক্যেও বিশ্বাস করি না। ঋষিদিগের প্রচারিত সত্য-সমূহ আমরা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রবৃত্ত হই না, অথবা আমাদের বুঝি সে যোগ্যতাও নাই; তাই পরের মুখে ঝাল খাইতে চাই। তবে, আজকাল অনেকেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন আলোচনা দ্বারা এই সব তত্ত্বে বিশ্বাসী হইতেছেন, ইহাও ভরসার কথা বটে। এখন নিবেদন এই যে, কি ভাবে বসিতে ও সাধনা করিতে হইবে সে বিষয়ে উপদেশ দিন।

গুরু। বৎস! তোমাদের এই সাধনা জাগ্রত সাধনা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতিমূলক সাধনা। এই সাধনায় কোন প্রকার আয়াস সহকারে আসনাদি করার প্রয়োজন নাই। যেভাবে বসিলে শরীরে আরামবোধ হয়, তাহাই 'আসন',—কায়ক্লেশপূর্ব্বক জোর করিয়া পদ্মাসনাদি করিলেই 'আসন' হয় না।

"স্থিরসুখমাসনম্" [পাতঞ্জল-যোগসূত্রম্]

অর্থ। যেভাবে বসিলে স্থিরভাবে সুখে অবস্থান করা যায়, তাহাই আসন।

বসিবার প্রণালীকেই যোগশাস্ত্রে 'আসন' বলা হইয়াছে। চৌরাশী লক্ষ যোনিতে জীব যে যে ভাবে উপবেশন করে, তাহাই চৌরাশী লক্ষ 'আসন'। সাধকদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ 'আসন' করিয়া বসিয়া থাকিতে ভাল লাগে, সে সেইরূপ সুখকর 'আসন' করিয়া প্রথমতঃ নিজ গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিবে। ধ্যানদ্বারা গুরুমূর্ত্তি সম্যক্‌ভাবে মনের মধ্যে উদিত হইলে এই মন্ত্রে গুরুদেবকে প্রণাম করিবে,—

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।

একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

প্রণামান্তে মনে মনে পাঠ করিবে,—

"মন্ত্রঃ সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবো নিরঞ্জনঃ।
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্ ॥"

বৎস, শ্রীগুরুকে নিরাকার ব্রহ্মের সাকার বিগ্রহ মনে করিবে। শ্রীগুরুই আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা। অন্য দেবতা ত কল্পনা করিয়া ধ্যান ও পূজা করিতে হয়। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥"

অনুমান-ভজন অপেক্ষা প্রত্যক্ষ-ভজনই শ্রেষ্ঠ। একমাত্র গুরুর ধ্যান ও পূজাদ্বারাই অজ্ঞান-নাশক জ্ঞান লাভ হইতে পারে। শ্রুতিতেও আছে,—

"দিব্যজ্ঞানোপদেষ্টারং দেশিকং পরমেশ্বরম্।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা তস্য জ্ঞানফলং লভেৎ ॥
যথা গুরুস্তথৈবেশো যথৈবেশস্তথা গুরুঃ।
পূজনীয়ো মহাভক্ত্যা ন ভেদো বিদ্যতেঽনয়োঃ ॥"

[যোগশিখোপনিষৎ]

অর্থ। যিনি দিব্যজ্ঞানের উপদেশ করেন, সেই গুরুকেই পরমেশ্বর-জ্ঞানে পরাভক্তির সহিত পূজা করিবে, তাহাতেই সাধক সেই গুরুর

জ্ঞানের ফল লাভ করিবেন। গুরুই ঈশ্বর, ঈশ্বরই গুরু; সুতরাং গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানে মহাভক্তির সহিত পূজা করিবে; গুরু ও ঈশ্বরে ভেদ নাই।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে,—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

অর্থ। যাঁহার ইষ্টদেবতায় পরাভক্তি আছে, আর দেবতায় যেমন গুরুতেও তেমনই ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই এই পূর্ব্বকথিত আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

গুরুর ধ্যান ও প্রণামাদির পর গুরূপদেশ অনুসারে শ্বাসের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদত্ত-নামজপ অভ্যাস করিবে। ইহাই তোমার সাধনা-বিষয়ে পুরুষকার; তৎপরে যাহা হইবার আপনা হইতেই হইবে। সিদ্ধপন্থার সাধনে আর কোন চেষ্টা বা আয়াসের প্রয়োজন নাই। জপকালে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি, যে যাহা করিতে চাহে, তাহাকে তাহাই করিতে দিবে; কোন প্রকার বাধা প্রদান করিবে না। প্রত্যহ শ্রদ্ধা ও তীব্র উৎসাহের সহিত গুরুবাক্য অনুসারে সাধনা করিবে। তীব্রসংবেগী সাধকদিগের সমাধিলাভ ও তাহার ফল অতি সত্বরই উপস্থিত হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! 'শ্বাসের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে জপ অভ্যাস' এই কথাটী আর একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস! আমাদের শ্বাসত্যাগকালে 'হং'-পূর্ব্বক এবং ভিতরে গ্রহণকালে 'সঃ'-পূর্ব্বক শব্দ হইতেছে। ইহাই অজপা জপ। বিনা চেষ্টায় জপ হইতেছে বলিয়াই এই 'হংস' মন্ত্রকে অজপা মন্ত্র কহে।

'হংস' মন্ত্রেরই সূক্ষ্মভাব 'ওঁ'কার—'ওঁ'কারেরই স্থূলভাব 'হংস'। যোগ-স্বরোদয়ে আছে,—

"প্রণবাজ্জায়তে হংসো হংসঃ সোহংপরো ভবেৎ।
হকারঃ শম্ভুরূপঃ স্যাৎ সকারঃ শক্তিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ। প্রণব (ওঁকার) হইতে 'হংসঃ' মন্ত্র উৎপন্ন হয় এবং 'হংসঃ'ই বিপরীত ভাবে 'সোহং' হয়। হকার শিব, এবং সকার শক্তি বলিয়া কথিত হয়।

এই 'সোহং'এর সকার ও হকারের লোপ হইলেই 'ওঁ' হয়।

"হকারার্ণং সকারার্ণং লোপয়িত্বা ততঃ পরম্।
সন্ধিং কুর্য্যাত্ততঃ পশ্চাৎ প্রণবোঽসৌ মহামনুঃ॥"
[যোগস্বরোদয়ঃ]

অর্থ। সকার ও হকার বর্ণ লোপ করিয়া, তাহার পর সন্ধি করিলেই মহামন্ত্র প্রণব (ওঁকার) প্রকাশ পায়।

অনাহত পদ্মে শব্দব্রহ্মরূপ ওঁকার এবং আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে বর্ণব্রহ্মরূপ ওঁকার আছে। সাধনায় কিছু অগ্রসর হইলে এই ধ্বনি ও বর্ণরূপী ওঁকারের অনুভব হয়। বৎস, যাবৎ উহা স্বদেহমধ্যে অনুভব করিতে সমর্থ না হইবে, তাবৎ শ্বাসত্যাগকালে হকারের স্থানে এবং শ্বাসগ্রহণ-কালে সকারের স্থানে তোমার গুরুদত্ত মন্ত্রই জপ করিবে। যেমন, যাহার গুরুদত্ত মন্ত্র 'রাম' সে হকারের স্থানেও 'রাম', সকারের স্থানেও 'রাম'—অর্থাৎ শ্বাস ও উচ্ছ্বাসের সহিত কেবল 'রাম রাম'ই জপ করিবে। এখানে 'রাম' শব্দে প্রত্যেকে নিজ মন্ত্র বুঝিয়া লইও। সর্ব্ব-প্রকার জপের মধ্যে শ্বাসে শ্বাসে জপই শ্রেষ্ঠ। কবীর সাহেব বলি-য়াছেন—

"কবীর মালা কাঠকি বহুত জন করি যোর।
মালা যোর শ্বাসকি য়াসে গাঁঠি নাহি সুমের॥"

অর্থ। কবীর বলেন, অনেকেই কাঠের মালা জপ করিয়া থাকে, কিন্তু তুমি তাহা করিও না। যাহাতে সুমেরুর গাঁট নাই, এমন শ্বাসের মালা জপ কর।

বৎস! সদ্‌গুরু মনোরূপ মালা জপ করিবার উপদেশ দেন। শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ গুটীসমূহ দিয়া ঐ মালা গাঁথিয়া লইলে, উহা হস্তের বিনা সাহায্যে দিবারাত্র ফিরিবে; তাহাতেই ৺ভগবানের নাম জপ হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব! জপের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান করিতে হইবে কি? কিরূপ ধ্যান করা ভাল?

গুরু। বৎস! কল্পনা করিয়া কোন মূর্ত্তি ধ্যান করিবার প্রয়োজন নাই। নাম জপ করিতে থাক, আপনা হইতেই কত মূর্ত্তি-দর্শন হইবে! তুমি যাঁহার নাম করিতেছ, তিনি তোমার দেহেই চৈতন্যরূপে আছেন, তিনি তোমারই 'আমি'-বুদ্ধির আশ্রয়ভূত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। তাঁহাকেই শাক্ত শক্তিরূপে, বৈষ্ণব বিষ্ণুরূপে, শৈব শিবরূপে, সৌর সূর্য্যরূপে, গাণপত্য গণেশরূপে এবং জ্ঞানী ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন। যে নামেই কেন ডাক না, ভাবিও তোমার দেহস্থিত চৈতন্যরূপী আত্মাকেই ডাকিতেছ। অবিদ্যাবশতঃ এক চৈতন্যসাগরে জলতরঙ্গবৎ নানা নাম ও রূপাদি অনুভূত হইতেছে। সকল নামরূপের অন্তরালেই এক চৈতন্যরূপী দেবতা বিদ্যমান রহিয়াছেন। গুরূপদিষ্ট সাধনাদ্বারা মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইলে আপনা হইতেই ধ্যান আসিবে। শ্রুতিতে আছে,—"ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ"। (নির্ব্বিষয় মনই ধ্যানস্বরূপ)। মন নির্ব্বিষয় হইলে আতসী পাথরে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণবৎ জ্ঞানের

আলো দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, যদ্দারা চৈতন্যরূপী দেবতাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যাইবে। বৎস, সূর্য্যকিরণ সর্ব্বস্থানে পতিত হইলেও, একগাছি তৃণকেও দগ্ধ করিতে পারে না; কিন্তু আতসী পাথরে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে, বহুরশ্মি কেন্দ্রীভূত (iocussed) হওয়ায় দাহিকাশক্তি উৎপন্ন হয়, এবং তাহা তৃণকে ভস্মীভূত করে;—আতসী পাথরের গুণই সূর্য্যকিরণকে কেন্দ্রীভূত করা। এইরূপ মন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত থাকায় তাহার অন্তরালবর্ত্তী চৈতন্যরূপী আত্মার জ্ঞান প্রকাশ পায় না; কিন্তু যখন মন গুরূপদিষ্ট উপায়ে একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন আপনা হইতেই জ্ঞানজ্যোতিঃ জ্বলিয়া উঠে এবং আমিত্ব-নাশদ্বারা মনোবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়। আমিত্বের নাশেই ভগবানের স্বরূপদর্শন।

বৎস! নামে যাহাতে রুচি হয়, সেইজন্য পূর্ব্বকথিত নির্দ্দিষ্ট চারি সময়ে সাধনা করা ভিন্নও, অনবরত শ্বাসে শ্বাসে জপ অভ্যাস করিবে —হাঁটিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, সর্ব্বদাই শ্বাসে শ্বাসে তাঁহার নাম স্মরণ করিবে। এইরূপে জপ করিতে করিতে যখন মন ও প্রাণ এক হইয়া যাইবে তখন সাধ্য কি যে অন্তর্যামী অন্তরে লুকাইয়া থাকেন। একটী দোঁহা আছে—

"সুমিরণমে মন লাইসে য্যায়সে কীট ভিরঙ্গ।
কবীর বিসারে আপ্‌কো হো যায় তেহি রঙ্গ॥"

অর্থ। যেমন ভ্রমর-ধৃত আর্সুলা কীট ভ্রমরের চিন্তাদ্বারা ভ্রমরই হইয়া যায়, হে কবীর! তেমনি ইষ্টদেবের চিন্তা করিতে করিতে আপন ভুলিয়া তাঁহারই রূপ হইয়া যাও।

শিষ্য। গুরুদেব! কেহ কেহ বলেন যে কোন বিশেষ স্থানে (যেমন নাভিচক্র, হৃদয়-পুণ্ডরীক অর্থাৎ হৃদয়স্থ অনাহত চক্র, মস্তকস্থ জ্যোতিঃ ও নাসিকা অর্থাৎ ভ্রূমধ্য, প্রভৃতি দেহাভ্যন্তরস্থ বিশেষ বিশেষ

দেশে) মন রাখিয়া জপাদি করা ভাল। এতন্মধ্যে কোন্ স্থানে মন রাখিয়া জপ করিব তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

গুরু। বৎস! তোমাকে কোন বিশেষ স্থানে মন রাখিয়া জপাদি করিতে হইবে না, কেবল শ্বাসবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে গুরূপদেশ অনুসারে চলাফেরা কর। সঞ্চারিত শক্তি যখন যেস্থানে প্রাণকে লইয়া যাইবে, মনও সেই স্থানে চলিয়া যাইবে, যেহেতু প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই মন চলিয়া থাকে। প্রাণের ক্রিয়া যখন যে চক্রে হইতে থাকিবে মনও আপনা হইতেই সেখানে স্থির হইয়া থাকিবে। এইরূপে স্বভাবতঃ যখন যে স্থানে মন যাইবে, সেখানেই জপ করিবে। সঞ্চারিত শক্তিই দেহাভ্যন্তরস্থ গুরু; ইনি যখন যাহা তোমাকে করাইবেন তাহাই করিয়া যাইও, তবেই তোমার মঙ্গল বা শান্তি হইবে; জোর করিয়া কিছুই করিতে নাই। সাধনা করিয়া যাও ক্রমশঃ সঞ্চারিত শক্তির ক্রিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে। দুচার দিনে বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলে না বলিয়া হতাশ হইও না। বিশ্বাস রাখিও, গুরুশক্তি ব্যর্থ হইবার নহে।

শিষ্য। পিতঃ! আপনার কৃপায় আমার হতাশ বা ব্যস্ত হইবার কিছুই নাই। ইতোমধ্যেই যখন ভিতরে একটী শক্তির খেলা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি তখন হৃদয়ে বিশ্বাস আছে যে নিয়মমত সাধনা করিয়া গেলে ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতে পারিব। তবে, শরীরটী সব দিন ভাল না থাকায় কখন কখন সাধনে বসিতেই আলস্যবোধ হয়, আর মনটীও জপে নিবিষ্ট হইতে চাহে না। এই বিঘ্ন নিবারণের উপায় কি?

গুরু। বৎস! সাধনাকালে এইরূপ চিত্তবিক্ষেপের বিঘ্নসমূহ আসিবেই, কিন্তু তাহাতে দেহসুখের প্রতি মমতাকৃষ্ট হইয়া পরমার্থ নষ্ট করিবে না। যোগের অন্তরায় নয়টী, যথা—

"ব্যাধিস্ত্যান-সংশয়-প্রমাদালস্যাবিরতি-ভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিত-ত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।"

[পাতঞ্জল-যোগসূত্রম্]

অর্থ। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব, অনবস্থিতত্ব এই নয়টী যোগের অন্তরায়।

ধাতু (শরীরস্থ বাত, পিত্ত ও কফ), রস (ভক্ষিত বস্তুর পরিণাম) ও করণ (ইন্দ্রিয়সমূহ), ইহাদের স্বাভাবিক অবস্থার ন্যূনাধিক্যকে 'ব্যাধি' বলে। চিত্তের অকর্ম্মণ্যতাকে 'স্ত্যান' বলে। ইহা এইরূপ, কি এইরূপ নয়, এই উভয়পক্ষনিষ্ঠ যে জ্ঞান তাহাকে 'সংশয়' বলে। সমাধির উপায়ের অননুশীলনকে 'প্রমাদ' কহে। দেহের ও মনের গুরুত্বহেতু যে প্রযত্নাভাব, তাহাকে 'আলস্য' কহে। চিত্তের বিষয়-প্রাপ্তির প্রতি লোভকে 'অবিরতি' কহে। বিপর্য্যয় জ্ঞান (অর্থাৎ এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান)কে 'ভ্রান্তিদর্শন' কহে। সমাধিভূমির অপ্রাপ্তিকে 'অলব্ধভূমিকত্ব' কহে। সমাধিভূমি লাভ করিয়াও তাহাতে স্থিতি-বিষয়ে সামর্থ্যহীনতাকে 'অনবস্থিতত্ব' কহে; সমাধিভূমি লাভ হইলেও, এই 'অনবস্থিতত্ব' দূর হওয়া না পর্য্যন্ত সমাধি সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না।

সাধনা আরম্ভ করার কয়েক দিন পরেই সর্দ্দি, পেটের পীড়া, অনিচ্ছায় রেতঃস্খলন প্রভৃতি হইতে পারে; তাহাতে ভীত হইবে না; এই সব প্রকৃত ব্যাধি নহে—এতদ্দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যাইবে ও শরীর নূতনভাবে গঠিত হইতে থাকিবে। কাহারও শরীরে কোন ব্যাধির বীজ লুক্কায়িত থাকিলে তাহাও ভাসিয়া উঠিয়া, কয়েক দিন ভোগাইয়া, বাহির হইয়া যাইবে। প্রথমেই এইরূপ নানা ব্যাধি উপস্থিত হইয়া সাধকের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকিবে। কিন্তু, বৎস! সাবধান,

এই সাধনাদ্বারা আমার অনিষ্ট হইল ভাবিয়া ভয় পাইয়া সাধনা ত্যাগ করিও না।

বিঘ্নসমূহ উপস্থিত হইলে, হতাশ না হইয়া, বহির্দৃষ্টিতে নাভিতে লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘমাত্রায় নাম জপ করিবে। শিবসংহিতায় আছে—

"প্রণবং প্রজপেদ্দীর্ঘং বিঘ্নানাং নাশহেতবে।"

অর্থ। এই সকল যোগবিঘ্ন নাশের জন্য দীর্ঘমাত্রায় প্রণব জপ করিবে।

বৎস! যাহারা প্রণব লাভ করে নাই, তাহারা বিঘ্ননাশের জন্য নিজ নিজ ইষ্টমন্ত্রই দীর্ঘমাত্রায় জপ করিবে। এইভাবে কিছুক্ষণ জপ করিলে শরীরে ভাল লাগিবে এবং মনেও সাধনার স্পৃহা জাগিয়া উঠিবে। তখন পুনঃ গুরূপদিষ্ট লক্ষ্যে মন রাখিয়া সাধনাদি করিতে থাকিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! আমাদের মধ্যে দেখিতেছি যে কাহারও কাহারও প্রথমেই শারীরিক হঠক্রিয়াদি, অর্থাৎ আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম এবং শরীরের ঘূর্ণাও হইতে থাকে, আর কাহারও বা প্রথম হইতেই আভ্যন্তরিক কম্পাদি অনুভব হইতে থাকে ; কেহ কেহ প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে না, কয়েকদিন সাধনা করার পর কিছু কিছু শারীরিক কম্পাদি অনুভব করে। এইরূপ হওয়ার কারণ কি? শক্তিসঞ্চার হইলে সকলেরই একরূপ ক্রিয়াদি হওয়া উচিত নহে কি? বাবা, আমি মধ্যে মধ্যে আপনাকে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করিতেছি ; এ অবোধ পুত্রকে ক্ষমা করিবেন।

গুরু। বৎস! তোমার এই প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক হইবে কেন? তুমি ত বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। এইরূপ সন্দেহ তোমাদের মত অনুভূতিমূলক-সাধনপ্রাপ্ত সাধকমাত্রেরই হইতে পারে। তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

জীবমাত্রেরই জন্মের কারণ পূর্ব্বসংস্কার। সকলের সংস্কার একরূপ নহে, এইজন্য আকৃতি প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বসংস্কারই জীবমাত্রকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। শুভ ও অশুভ ভেদে কর্ম্মের সংস্কার দুই প্রকার। গুরুর কৃপা সকল শিষ্যে সমানভাবে পতিত হইলেও তাহা, সূর্য্যকিরণবৎ, সর্ব্ব আধারে সমানভাবে প্রতিফলিত হয় না। যেমন সূর্য্যকিরণ সর্ব্বত্র সমানভাবে পতিত হইলেও, স্বচ্ছ কাচ ও জলে তাহার প্রকাশ অধিক, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত শুভকর্ম্মের ফলে যাহার চিত্ত যতটুকু নির্ম্মল হয়, তাহাতে পতিত গুরুকৃপা সেই পরিমাণেই বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব শুভসংস্কারবশতঃই সাধক গুরুতে ভক্তি ও তাঁহার উপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা লাভ করে। পূর্ব্বসংস্কারবশতঃই সাধকদিগের অধিকারের তারতম্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বসংস্কার না থাকিলে সকলেই ত সমান অধিকারী হইত। এইজন্য পিপীলিকাগতি, বানরগতি ও পক্ষিগতি ভেদে শক্তিসঞ্চারিত শিষ্যও তিন প্রকার। তাহা কিরূপ, বিস্তারিতভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর—

(১) যেমন পিপীলিকা মন্দ মন্দ গতিদ্বারা অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে বৃক্ষাগ্রস্থ ফল প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অধম অধিকারী শিষ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইলে ধীরে ধীরে যোগক্রিয়াদি প্রকাশ পাইতে থাকে এবং ক্রমে সমাধিলাভ হয়। এইরূপ শিষ্যে ধীরভাবে শক্তির খেলা হইতে থাকে বলিয়া প্রথমতঃ তাহার কিছুই অনুভব হয় না, কিন্তু বিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের সহিত গুরূপদিষ্ট নাম সাধনা করিয়া গেলে সে ক্রমশঃই তাহার ফল দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত ও পুলকিত হয়।

(২) যেমন বানর এক শাখা হইতে শাখান্তরে উল্লম্ফনপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া ফল লাভ করে, তদ্রূপ মধ্যম অধিকারী শিষ্যে শক্তি সঞ্চারিত হইলেই, সে স্পন্দনাদি বেশ অনুভব করিতে থাকে, এবং

পরে পরপর নানাক্রিয়া (আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামাদি) হইতে থাকে ও পরিণামে সমাধিলাভ হয়।

(৩) যেমন পক্ষী উড্ডয়নদ্বারা শীঘ্রই ফল লাভ করে ; তদ্রূপ যিনি উত্তম অধিকারী (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মেই সাধনায় অগ্রসর হইয়া রহিয়াছেন) এমন সাধক, শক্তি সঞ্চারিত হইলেই তীব্রভাবে কম্পাদি অনুভব করেন এবং অচিরেই ইষ্টবস্তুর প্রতি একাগ্রতা লাভ করিয়া সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হন।

বৎস, মনে কর যেন তিন ব্যক্তি কলিকাতা হইতে পদব্রজে ৺কাশী রওনা হইয়াছে ; তন্মধ্যে একজন লিলুয়ায় আসিয়া, দ্বিতীয় ব্যক্তি আসানসোলে আসিয়া এবং তৃতীয় ব্যক্তি ৺গয়ায় আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এখন, তিন স্থানে তিন ব্যক্তিই যখন জাগরিত হইল, তখন প্রত্যেকেই কি এক স্থান হইতে রওনা হইবে ?

শিষ্য। না, প্রভো ! তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে ?

গুরু। তাহা যেমন সম্ভব নহে, তদ্রূপ পূর্ব্বজন্মে সাধনার পথে যে যতদূর অগ্রসর হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহজন্মে জাগরিত হইলে তাহার সেখান হইতে সাধনা আরম্ভ হইবে। এইজন্যই গুরুকৃপায় নিদ্রিতা শক্তি জাগরিতা হইলে সকলে একরূপ অনুভব করে না।

শিষ্য। গুরুদেব ! কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একজন সাধক সাধনায় বেশ অগ্রসর হইতেছে ও নানা অনুভূতি লাভ করিতেছে, কিন্তু কয়েক দিন পরে, তাহার সাধনায় আর তেমন মনোযোগ নাই, বিষয়-চর্চ্চায় ভয়ানক মত্ত ! ইহারই বা কারণ কি ?

গুরু। বৎস, সকলেই যে এক জীবনে পূর্ণতা লাভ করিবে, এমন কোন নিয়ম নাই। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রদ্ধাবান্ ও তীব্রসংবেগী সাধকদেরই সত্বর সমাধি ও পরা শান্তি লাভ হয়। ফলতঃ

উত্তম অধিকারী হইয়াও যদি তীব্র যত্ন না করে, তাহার সিদ্ধি অতি দূরে। গীতায় আছে—

"প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥"

অর্থ। অতিশয় যত্নশীল যোগী ক্ষীণপাপ হইয়া অনেক জন্মে উত্তরোত্তর শুভসংস্কারসমূহ সঞ্চয়পূর্ব্বক, সেই সংস্কারসমূহের বলে সম্যক্‌-রূপে সিদ্ধ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী হন এবং তৎপরে প্রকৃষ্টগতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।

বৎস, বর্ত্তমান জন্মই যাঁহার শেষ জন্ম, তাঁহারই সিদ্ধিলাভ আসন্ন। যে যত জন্ম পশ্চাতে আছে তাহার সিদ্ধিলাভে ততই অধিক সময় লাগিবে, সন্দেহ কি? এইজন্যই সাধকদিগের মধ্যে ক্রিয়ার ও অনুভূতির এইরূপ তারতম্য দেখা যায়।

সপ্তম বিবৃতি

শিষ্য। গুরুদেব! কোন কোন সময় সাধনার উপর এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, কুণ্ডলিনী-জাগরণ ত দুর্লভ, তাহা সহজে কি করিয়া সম্ভবে? তবে কি ইহা কোন যাদুবিদ্যা? তখন মনে হয় যে, গুরুদেব, বোধ হয়, একজন যাদুকর (hypnotist).

গুরু। বৎস! দুর্লভ বস্তু সহজে লাভ হইলে যোগবাশিষ্ঠোক্ত মণিকাচোপাখ্যানের মতই হইয়া থাকে। সেই উপাখ্যানটী বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা এক ব্রাহ্মণ চিন্তামণি-লাভের জন্য বনে গিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ভগবৎকৃপায়, অল্পদিন তপস্যার পরই, অমূল্য চিন্তামণি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন "ইহা কি বাস্তবিকই চিন্তামণি? আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে, এখনই চিন্তামণি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? থাক্, স্পর্শ করিয়া কাজ নাই; হয় ত, স্পর্শ করিলে, মন্দভাগ্যবশতঃ ইহা কাচও হইয়া যাইতে পারে।" এইরূপে নানা বিচার ও আলোচনার পর ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন, "ইহা কখনই চিন্তামণি নহে। যদি চিন্তামণিই হইবে, তবে এত সহজে মিলিল কেন? যাক্, ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। এদিকে চিন্তামণিও যথা-স্থানে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ধ্যানাবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একদিন বালকেরা খেলা করিতে করিতে একখণ্ড কাচ তাঁহার নিকট নিক্ষেপ করিল। তিনি ধ্যানান্তে তদ্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে মনে বলিতে

লাগিলেন—"ওঃ! এতদিনে আমার তপস্যা সার্থক হইল,—যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা এতদিনে শ্রীভগবানের কৃপায় মিলিল।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ঐ কাচখণ্ড হস্তদ্বারা তুলিয়া লইয়া গৃহে প্রস্থান করিল। সেই হতভাগ্য কাচখণ্ড পাইয়াই চিন্তামণিভ্রমে মহা আনন্দিত! চিন্তামণি দ্বারাই তাহার সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি হইবে মনে করিয়া সে তাঁহার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দূরদেশে চলিয়া গেল। এখন ব্রাহ্মণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। যখন সে দেখিতে পাইল যে, তাহার কোন অভাবেরই নিবৃত্তি হইতেছে না, তখন বেশ বুঝিতে পারিল যে সে যাহা পাইয়াছে তাহা অনর্থনিবারণকারী চিন্তামণি নহে, অকিঞ্চিৎকর কাচ মাত্র। বৎস, সহজে দুর্লভ বস্তু পাইলে এইরূপই মনে হয়! হৃদয়-কষ্টি-পাথরে কষিয়া দেখনা, তোমরা সোনা পাইয়াছ কি পিত্তল পাইয়াছ;—পরীক্ষা করিয়াই দেখনা, চিন্তামণি পাইয়াছ কি কাচ পাইয়াছ;—যাহা পাইয়াছ তাহার সাধনা করিয়া দেখ, গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ অনুভূতি মিলে কি না। বৎস, তোমাকে দ্বিতীয় দিনের বিবৃতিতে বলিয়াছি যে "গুরুবাক্য, শাস্ত্র ও নিজ অনুভূতি, এই তিনটী যদি এক হয়, তবে তত্ত্বসম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না, এবং এইরূপ নিশ্চিত অনুভূতিমূলক-জ্ঞানসাহায্যেই সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে।" এইরূপে শাস্ত্র বা আপ্তপ্রমাণদ্বারা সংশয় দূর করিয়া নাম-সাধনায় মনোনিবেশ করিবে। সাধনায় শ্রদ্ধা হইলেই গুরুতেও শ্রদ্ধা হইবে, বা গুরুতে শ্রদ্ধা থাকিলেই সাধনাতেও শ্রদ্ধা হইবে। গুরুর উপর সংশয় পতনের মূল। কখন কখন সংশয়রূপ সয়তান, মিত্রবেশে আসিয়া, ফাঁকি দিয়া শ্রদ্ধাকে লইয়া পলায়ন করে এবং সাধককে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া বিষম দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে। একটী গল্প বলিতেছি, শুন।

লঙ্কাযুদ্ধকালে, একদা বিভীষণ কোন এক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে রাম ও লক্ষ্মণকে রাখিয়া, হনুমানকে প্রহরী নিযুক্ত করেন এবং বলিয়া দেন "এই প্রাচীরমধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না।" এদিকে মহীরাবণ, পাতালে ৺ভদ্রকালীর নিকট রাম ও লক্ষ্মণকে বলি দিবার জন্য, তাহাঁদের অন্বেষণে বহির্গত হইল। সে অনুসন্ধানদ্বারা বুঝিতে পারিল যে, ঐ সুরক্ষিত প্রাচীরের মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ লুক্কায়িত আছেন। তখন সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে হনুমানের নিকট আগমনপূর্ব্বক রাম-লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া, দ্বার ছাড়িয়া দিবার জন্য আদেশ করে। কিন্তু হনুমান বিভীষণের আদেশ ভিন্ন কিছুতেই দ্বার ছাড়িয়া দিবেন না। অতঃপর মহীরাবণ, উপায়ান্তর না দেখিয়া, একবার শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের বেশে, আবার মাতা কৌশল্যার বেশে হনুমানকে প্রতারিত করিবার জন্য উপস্থিত হইল। কিন্তু হনুমান ঐ স্থানে ও ঐ সময়ে দশরথ কিংবা কৌশল্যার আগমন অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ বিভীষণের আদেশবাক্য স্মরণ করিয়া, কিছুতেই দ্বার ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন মহী-রাবণ অনন্যোপায় হইয়া বিভীষণের রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইল। তখন হনুমান তাহাকে, বিভীষণজ্ঞানে, দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপে মায়াবী মহীরাবণ নিদ্রাভিভূত রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া পলাইয়া গেল। তাহার পর যখন বিভীষণ রাম ও লক্ষ্মণের সংবাদ লইতে আসিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহারা অপহৃত হইয়াছেন। অতঃপর রাম ও লক্ষ্মণের উদ্ধার করিতে হনুমানকে অনেক বেগ পাইতে হইল। এখানে এই গল্পটী বলিবার তাৎপর্য্য বুঝিলে ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুঝিলাম। এই দেহরূপ প্রাচীরমধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি রামলক্ষ্মণ, সাধকই হনুমান, গুরুই বিভীষণ এবং সংশয়ই

মহীরাবণ। সংশয়ই সাধককে ফাঁকি দিয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তিকে লইয়া পলায়নপূর্ব্বক সাধককে বিষম দুর্দ্দশায় ও ক্লেশে পাতিত করে; তাহার পর যখন সে অহৈতুক-কৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুর কৃপায় দেখিতে পায় যে, তাহার সর্ব্বস্বধন অপহৃত হইয়াছে, তখন আবার তাহা উদ্ধার করিয়া লইতে তাহাকে অনেকটা বেগ পাইতে হয়। সুতরাং সংশয়ই সাধকের মহা অনিষ্টের মূল, ইহাই সাধককে সিদ্ধিলাভের পথ হইতে বিচ্যুত করে। গীতায়ও পড়িয়াছি,—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥"

অর্থ। অজ্ঞ অর্থাৎ অনাত্মজ্ঞ, অশ্রদ্দধান অর্থাৎ গুরু ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবিহীন এবং সংশয়াত্মা ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হয়। [অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরা অধোগতি প্রাপ্ত হইলেও তাহাদিগের ভ্রম দূর হইলেই উন্নতিলাভের আশা আছে; কিন্তু সংশয়াত্মা সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ, তাহার উন্নতিলাভের আশা সুদূরপরাহত]। সংশয়াত্মা ব্যক্তির কি ইহলোকে কি পরলোকে কোথায়ও সুখ হয় না।

গুরু। বৎস, তবেই দেখ, সংশয় কি ভয়ানক বস্তু! সাধকের পক্ষে সংশয় রাখা কর্ত্তব্য নহে।

শিষ্য। পিতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সংশয়রূপ পাপ হৃদয়ে আর না আসে।

গুরু। হে পুত্র! তুমি যে আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছ তাহাতে বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। সর্ব্বদা সরলহৃদয়ে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। গুরুর নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিলে জ্ঞানলাভ করা যায় না।

শিষ্য। গুরুদেব! দীক্ষার সময় জপ করিতে করিতে মনের বেশ

একাগ্রতা হইয়াছিল, কিন্তু এখন মনের বড়ই চঞ্চলতা। এই চঞ্চলতা কিসে নিবারিত হয় তাহা বলুন। এইজন্য বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছি।

গুরু। বৎস! আমরা কি ইহজন্মে, কি শত শত পূর্ব্বজন্মে, যত কিছু কর্ম্ম করিয়াছি তৎসমুদয়ের সংস্কার মূলাধারে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ সঞ্চিত ক্রিয়ারাশির যে শক্তি তাহাই কুণ্ডলিনীশক্তি। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে সংস্কার ত্রিবিধ। সংস্কারের জন্যই কুণ্ডলিনীশক্তি কুটিলাকৃতি। মন সংস্কাররাশির কৌটাসদৃশ। কুণ্ডলিনী যতই বক্রতা ত্যাগ করিয়া ঋজুতা প্রাপ্ত হইবে, ততই মগ্ন সংস্কারসমূহ পীড়াপ্রাপ্ত মৎস্যের ন্যায় উপরে ভাসিয়া উঠিতে থাকিবে। সংস্কার উঠিলেই মনও চঞ্চল হয়। সংস্কারসমূহ ভাসিয়া উঠিয়া বিলীন হইয়া গেলেই, মনও আপনা হইতেই উপশমপ্রাপ্ত হয়। যাবৎ মন উপশম-প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা দূর না হয়, তাবৎ মন স্থির হইল না বলিয়া বৃথা চিন্তা করিয়া মনকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলিও না। অধ্যবসায়ের সহিত ধীরভাবে সাধন করিয়া যাও, সময়ে আপনা হইতেই মন-ভূত অবসর গ্রহণ করিবে—চঞ্চলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হইবে। একটী গল্প বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একদিন কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভূতসিদ্ধি করিতে পারিলে প্রচুর ধন ও সুখসৌভাগ্যের অধিপতি হইতে পারিবে মনে করিয়া, এক ভূতসিদ্ধ মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইল। "ভূতের সাহায্যে যেমন ঐহিক অভীষ্ট-লাভ হইতে পারে তেমনই মহা অনর্থেরও সম্ভাবনা আছে" এইরূপ বলিয়া ভূতসিদ্ধ মহাপুরুষ ঐ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে এই সংকল্প পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। সে কিন্তু কিছুতেই তাহার সংকল্প ত্যাগ করিল না। অবশেষে তাহার আগ্রহাতিশয্য দর্শনে সেই মহাপুরুষ

তাহাকে ভূতমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সাধনার কৌশল বলিয়া দিলেন। গুরূপদেশ অনুসারে কয়েক দিন সাধনার পর, হঠাৎ একদিন ভূত ভয়ঙ্কর বেশে ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আমাকে কেন ডাকিয়াছ ? শীঘ্র বল।" ব্রাহ্মণ বলিল "আমার নিকট তোমাকে দাসভাবে থাকিতে হইবে এবং যখন যাহা বলিব তাহা নির্ব্বিচারে পালন করিতে হইবে।" ভূত বলিল "মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন তাহাতে সম্মত আছি, কিন্তু আপনাকেও একটী চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হইবে—কর্ম্ম ভিন্ন একমুহূর্ত্তও আমাকে বসাইয়া রাখিতে পারিবেন না। যখনই আমাকে কর্ম্ম দিতে না পারিবেন, তখনই পূর্ব্বকৃত সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিব, অধিকন্তু আপনাকেও বিনাশ করিব। দেখুন, এই চুক্তিতে রাজি আছেন কি না।" ব্রাহ্মণ বলিল "ওহে বাপু, আমার কত কাজ, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া কাজ করিলেও ফুরাইবে না। যাক্, অধিক কথায় প্রয়োজন নাই; তোমার সর্ত্তেই সম্মত আছি; এখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। দেখ, আমার ঘরবাড়ী নাই বলিলেই হয়; অগ্রে পুকুর কাটিয়া উত্তম ঘরবাড়ী বানাও।" আদেশপ্রাপ্তিমাত্র ভূত এক সুরম্য অট্টালিকা ও বৃহৎ পুষ্করিণী প্রস্তুত করিল,—সে ছয় মাসের কাজ এক মুহূর্ত্তে সম্পন্ন করিল। ব্রাহ্মণ ভাবিল "বেশ! আমার ত প্রাসাদের মত বাটী হইল, কিন্তু অর্থ ভিন্ন ত কিছুই হয় না।" তাই তখন সে ভূতকে উপযুক্ত অর্থ আহরণের জন্য আদেশ করিল। আজ্ঞামাত্র ভূত মুহূর্ত্তমধ্যে রাশীকৃত অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিল। এইরূপে অল্পকালমধ্যেই ভূত ব্রাহ্মণের সর্ব্বপ্রকার ঐহিক অভাব পূর্ণ করিয়া দিল। ভূত তখন কাজ চাহিতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ আর কাজ দিতে পারিতেছে না। তখন ভূত বলিল "এখন চুক্তি অনুসারে আমি তোমার সর্ব্বস্ব নষ্ট করিব ও তোমাকে বিনাশ করিব।" ব্রাহ্মণ

ভূতকে রোষকষায়িতলোচনে নিজের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, ভূতও ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্ধাবন করিল। ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে নিজ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল "প্রভো, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, ভূতের হাতে বুঝি প্রাণ যায়!" শিষ্যের কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়া গুরু বলিলেন "বৎস! ভয় নাই, ভয় নাই, আশ্বস্ত হও। পূর্ব্বেই ত তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, ভূত-সিদ্ধিতে মহা অনর্থেরও সম্ভাবনা আছে। যাক্, এখন তোমাকে বলি-তেছি, তুমি বাড়ী যাইয়া তোমার বাড়ীর মধ্যস্থলে একটা বাঁশ পুতিবে এবং ভূতকে অনবরত একবার বাঁশের উপরে উঠিতে ও একবার নীচে নামিতে বলিবে; তাহা হইলেই ঐ দুষ্ট ভূত চিরকাল ঐ কর্ম্ম করিতে থাকিবে, তোমার আর কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ গুরুর উপদেশ শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বাটীতে আসিয়া তাহাই করিল, আর ভূতও তদবধি কেবল বাঁশের উপরে ও নীচে উঠানামা করিতে লাগিল। ভূত অবিরাম এইরূপ একই কাজ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল; এবং অবশেষে ব্রাহ্মণকে বলিল "হে প্রভো! আমাকে এখন অবসর দিন; আমি যাহা যাহা আপনাকে দিয়াছি, সে সব আপনারই রহিল, আমি আর আপনার কোন অনিষ্ট করিব না।" ব্রাহ্মণ ভূতের কথা শুনিয়া, হৃষ্টচিত্তে ভূতকে অবসর দিল এবং তদবধি নিশ্চিন্তমনে সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

বৎস! আমাদের মনটী ঐরূপ ভূতসদৃশ, সঙ্কল্পদ্বারা কত ভাঙ্গিতেছে ও গড়িতেছে! সে এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারে না,—সর্ব্বদা কোন না কোন ব্যাপার লইয়া তাহার থাকা চাই। অগ্নির স্বভাব যেমন উষ্ণতা তেমনই মনের স্বভাব চঞ্চলতা। চঞ্চলতাবশতঃ সঙ্কল্প ও বিকল্প এবং তাহা হইতেই কর্ম্ম। মন নিঃসঙ্কল্প হইয়া ক্ষণকালও

থাকিতে পারে না। তাই, যখন সাধক সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইষ্টচিন্তা করিতে বসেন, তখনই মন-ভূত কর্ম্ম অভাবে নানা সঙ্কল্প-বিকল্পদ্বারা সাধককে আক্রমণ করিতে থাকে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে অপদার্থ করিয়া ফেলে। বৎস! মন-ভূতকে দমন করিতে হইলে সদা এক তত্ত্ব অভ্যাস করিতে হইবে। * সাধকের দেহরূপ গৃহে বংশদণ্ডসদৃশ সুষুম্না নাড়ী। গুরূপদেশানুসারে সর্ব্বদা মন-ভূতকে সুষুম্না নাড়ীর নীচ হইতে উপরে ও উপর হইতে নীচে অর্থাৎ মূলাধার ও সহস্রারের মধ্যে উঠা-নামা করাইতে পারিলে সে আপনা হইতেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে—সর্ব্বসঙ্কল্পরহিত হইবে। কল্পনারাহিত্যই চিত্তনাশ, চিত্তের নাশ হইলেই চিৎএর প্রকাশ—আত্মানুভূতি; সুতরাং সঙ্কল্পরূপী চিত্তের নাশই মোক্ষ। †

বৎস, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনকে স্থির করার জন্য ব্যাকুল হইয়া মনকে আরও অস্থির করিয়া তুলিও না; কেবল গুরূপদেশানুসারে সাধন করিয়া যাও;—কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, কর্ম্মফলে নহে। দেখিবে এই স্বাভাবিক সহজ যোগদ্বারা, মন-ভূত আপনা হইতেই স্থির হইয়া ক্রমে মরিয়া যাইবে।

শিষ্য। গুরুদেব! গল্পটী বড়ই সুন্দর। বাস্তবিক মন-ভূতকে লইয়া আমরা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। এখন আপনার অনুগ্রহে যদি উহার দমন হয়, নতুবা আমাদের দ্বারা কিছুই হইবার নহে।

গুরু। বৎস, অনুগ্রহ বস্তুটী কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ? 'অনু' শব্দের অর্থ—পশ্চাৎ এবং 'গ্রহ' শব্দের অর্থ—গ্রহণ,—'অনুগ্রহ' শব্দের অর্থ পশ্চাৎ গ্রহণ। শ্রীগুরুর মুখ হইতে উপদেশ শুনিবে এবং তদনুযায়ী

* "তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।" [পাতঞ্জল-যোগসূত্রম্]

† "সংকল্পনাশ এব মোক্ষঃ।" [যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণম্]

কার্য্য করিবে, তবে না 'অনুগ্রহ'-লাভ? গুরুদত্তনামরূপ প্রাণসূত্রের নাটাইটী ঘুরাও মনঘুড়ী আপনা হইতেই হস্তগত হইবে। নাটাই হাতে থাকিতে কে কবে সুদূরস্থিত ঘুড়িকে হস্তগত করার জন্য ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়াছে? বুঝিলে ত?

শিষ্য। হাঁ, গুরুদেব, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। মনটাই আমাদের ঘুড়ির মত এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। মনঘুড়ির সূতা হইয়াছে প্রাণ অর্থাৎ উহা প্রাণসূত্রে বাঁধা; আর নাটাই হইয়াছে গুরুদত্ত শক্তি-পুটিত মন্ত্র। নাটাই ঘুরাইলে যেমন সূত্রসংযমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়িও ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া হস্তগত হয়, গুরুদত্ত শক্তিপুটিত মন্ত্রজপদ্বারা প্রাণসংযমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনও ক্রমশঃ আয়ত্তীভূত হইতে থাকিবে। তবে যে যত বেশী বেশী নাটাই ঘুরাইবে, তাহার ঘুড়িও তত শীঘ্র শীঘ্র হস্তে আসিবে—যে যত অধিক সময় সাধনা করিবে, তাহার তত শীঘ্র শীঘ্র ফললাভ হইবে; যিনি দিবানিশি অষ্টপ্রহর শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপ করিতে পারিবেন, তাঁহার অতি শীঘ্রই ফললাভ হইবে।

গুরু। হাঁ, বৎস, বেশ বুঝিয়াছ। তোমার বুদ্ধি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলাম। আশীর্ব্বাদ করি অচিরে সিদ্ধমনোরথ হও।

শিষ্য। পিতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদই এ অধমের সৌভাগ্যের মূল হইবে, সন্দেহ নাই। এখন একটী কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, সকল দিন সমান সাধনা হয় না কেন? কোনদিন অল্প সময়েই সাধনা বেশ জমিয়া উঠে ও বেশ আনন্দ হয়, আবার কোনদিন বা তেমন হয় না; ইহার কারণ কি?

গুরু। সকল দিন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা একরূপ থাকে না, সেজন্য সকল দিন সাধনাও সমান হয় না। যাবৎ আত্মতত্ত্বে স্থিতি-

লাভ না হইবে, তাবৎ উঠানামার ভিতর দিয়াই চলিতে হইবে। একদিনে কেহই হাঁটিতে শিখে নাই। বৎস! আনন্দ ও নিরানন্দ সমান জ্ঞান করিয়া আশান্বিতচিত্তে সাধনা করিতে থাক ; সময়ে নিজ আত্মায়ই পূর্ণশান্তি লাভ হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব! সাধনা আরম্ভ করার কয়েকদিন পর হইতেই যেন শরীরটা ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, অথচ শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মঠ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ করিতেছি। শরীরটা এভাবে ক্ষীণ হইবার কারণ কি?

গুরু। যেমন বর্ষার জলে মাটী নরম ও স্ফীত হইয়া কাদা হয়, কিন্তু সূর্য্যের তাপে সেই মাটী শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইয়া দৃঢ় হয় ; তদ্রূপ পার্থিব ও জলীয় রসবাতে শরীরকে পুষ্ট রাখে, কিন্তু প্রাণরূপ রবির তাপে অর্থাৎ প্রাণায়ামে ঐ রসবাত দূরীভূত হয় এবং শরীর সঙ্কুচিত অর্থাৎ কৃশ অথচ দৃঢ় ও কর্ম্মোপযোগী হয়। শরীরের কৃশতা হঠযোগেরই একটী লক্ষণ; সুতরাং তুমি যে অবস্থার কথা বলিলে, তাহাতে হঠযোগেরই একটী লক্ষণ প্রকাশ পাইযাছে, বুঝিতে হইবে। বৎস! এই সাধনে ক্রমশঃই এইরূপে হঠ ও অন্যান্য যোগলক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকিবে। রস ও বাতে শরীরকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে, কিন্তু প্রাণায়ামদ্বারা তাহা দূর হওয়াতেই শরীর হাল্‌কা ও কর্ম্মঠ হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! হঠসিদ্ধির অন্যান্য লক্ষণ কি, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন।

গুরু। "বপুঃকৃশত্বং বদনে প্রসন্নতা
নাদস্ফুটত্বং নয়নে সুনির্ম্মলে।
অরোগতা বিন্দুজয়োঽগ্নিদীপনং
নাড়ীবিশুদ্ধির্হঠযোগলক্ষণম্॥"

[হঠযোগ-প্রদীপিকা]

অর্থ। হঠসিদ্ধি হইলে শরীর কৃশ, মুখ প্রফুল্ল, বাক্য স্পষ্ট ও চক্ষু বিমল অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি পরিষ্কার হয়; এবং রোগহীনতা, বীর্য্যস্তম্ভন, দৈহিক অগ্নিবৃদ্ধি ও নাড়ীশুদ্ধি হয়। এই সমস্ত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সাধকের হঠসিদ্ধি হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে,—

"লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং
বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্রপুরীষমল্পং
যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥"

অর্থ। যোগতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন যে, যোগের প্রথম কালে শরীরের লঘুতা, অরোগতা, লোভশূন্যতা, বর্ণের উজ্জ্বলতা, বাক্যের স্পষ্টতা বা মাধুর্য্য, নানা সুগন্ধের অনুভব ও মলমূত্রের অল্পতা হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। এখন আপনার কৃপায় এযাবৎ সাধনদ্বারা যাহা যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিয়া, সেই সকল বিষয়ে কিছু উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বৎস! আজ থাক্। এখন সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আপন আপন উপাসনায় যাওয়া যাক্। আগামী কল্য তোমার কথা শুনিব এবং তৎসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে তাহাও বলিয়া দিব।

অষ্টম বিবৃতি

গুরু। বৎস! অদ্য তুমি তোমার অনুভূতিসকল ব্যক্ত করিতে এবং যাহা যাহা জানিবার ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিতে পার। আমি শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা তোমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি নিজ অনুভূতির সহিত গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের ঐক্য হয়, তবেই অনুভূতি সংশয়রহিত হয়; এবং সেইরূপ অনুভূতিমূলক সাধনদ্বারাই শীঘ্র আত্মোপলব্ধিরূপ সিদ্ধি আয়ত্ত হইয়া থাকে। সাধক, গুরু ও শাস্ত্রকার ঋষি এই তিনের অনুভূতি যে বিষয়ে এক হইবে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। এখন তোমার বক্তব্য বল।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার কৃপায়, দীক্ষার সময়েই আমার বেশ কম্পন অনুভূত হইয়াছিল; তখন, বোধ হইতেছিল, যেন শরীরমধ্যে বৈদ্যুতিকপ্রবাহ খেলিতেছে। তাহার পর একদিন, যখন বসিয়া নামসাধন করিতেছি, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত একটা সূক্ষ্ম বাঁশের নলের ন্যায় রন্ধ্র রহিয়াছে এবং তাহার মধ্য দিয়া প্রাণ উঠানামা করিতেছে; তখন মনে এমন একটা আনন্দ ও শান্তির অবস্থা উৎপন্ন হইল যে, তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। তখন প্রাণবায়ু যেন নাসিকার মধ্য দিয়া চলিতেছিল না!

গুরু। বৎস! তোমার পূর্ব্বসংস্কার অত্যন্ত ভাল বলিয়াই এইরূপ উচ্চানুভূতি এত শীঘ্র শীঘ্র আসিয়াছে। বাঁশের নলের ন্যায় যাহা অনুভব করিয়াছ, তাহাই সুষুম্না নাড়ী, তাহার মধ্য দিয়াই অন্তর্মুখী

প্রাণশক্তির (কুণ্ডলিনীশক্তির) উঠানামা হয়। ৺মায়ের কৃপায় সুষুম্নাতে প্রাণের উঠানামা হইতেছিল বলিয়াই নাসিকার ভিতরের শ্বাসপ্রবাহ বুঝিতে পার নাই। যোগশিখোপনিষদে আছে—

"যথা করী করেণৈব পানীয়ং প্রপিবেৎ সদা।
সুষুম্নাবজ্রনালেন পবমানং গ্রসেত্তথা॥"

অর্থ। যেমন হস্তী সর্ব্বদা শুণ্ডের দ্বারাই জলপান করে, তদ্রূপ যোগী সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ীদ্বারাই প্রাণবায়ুকে গ্রাস অর্থাৎ লয় করেন।

সুষুম্নায় এই প্রাণবায়ু-প্রবাহদ্বারা বাঁশের গাঁইট ভেদ করার ন্যায় সুষুম্নামধ্যস্থ গ্রন্থিত্রয়ের ভেদ হইয়া যায়। যোগশিখোপনিষদে আছে—

"ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়ো বংশে তপ্তলোহশলাকয়া।
তথৈব পৃষ্ঠবংশঃ স্যাদ্ গ্রন্থিভেদস্ত বায়ুনা॥"

অর্থ। যেমন তপ্তলোহশলাকাদ্বারা বাঁশের গাঁইট ভেদ করা হয়, তদ্রূপ প্রাণবায়ুদ্বারা পৃষ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড)-মধ্যবর্ত্তী সুষুম্নাস্থিত গ্রন্থিত্রয়ের ভেদ হইয়া থাকে।

শিষ্য। পিতঃ! বহুভাগ্যবলে আপনার ন্যায় সদ্‌গুরুলাভ অদৃষ্টে ঘটিয়াছে, তাই আপনার কৃপায় এই সমস্ত অনুভব করিতে পারিতেছি। এক দিন সাধনা করিতে করিতে শরীর খুব দুলিতে লাগিল এবং পরে ভাবাবস্থায় নৃত্যগীতাদি হইতে লাগিল, বোধ হইল যেন ভয়ানক নেশা করিয়াছি!

গুরু। বৎস! ভক্ত রামপ্রসাদের শক্তিজাগরণ হইলে পর তিনি এই দোল অনুভব করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"দোলে দোলে রে আনন্দময়ী করালবদনী।
আমার হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে দিবস-রজনী॥

ইড়া পিঙ্গলা নামা, সুষুম্না মনোরমা,
তার মধ্যে নাচে শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ॥
আবির কুঙ্কুম পায় কিবা শোভা হয়েছে তাঁয়,
কামাদি মোহ যায়, হেরিলে অমনি ॥
যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
দ্বিজ রামপ্রসাদের বোল, দোল মা ভবানি ॥”

বৎস, রামপ্রসাদ এক দিন নামের নেশায় হেলিতে দুলিতে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পথিপার্শ্বস্থ এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল “বেটা মদ খাইয়া মাতাল হইয়া চলিয়াছে।” তাহা শুনিয়া রামপ্রসাদ গাহিলেন—

“সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতাল মেতেছে আজি, মদ-মাতালে মাতাল বলে ॥
গুরুদত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে,
(আমার) জ্ঞান শুঁড়িতে চুয়ায় ভাটী, পান করে মোর মন-মাতালে ॥
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা (মা)
(রাম)প্রসাদ বলে, এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে ॥”

দেখ, বৎস, তুমি আজ যাহা অনুভব করিয়াছ তাহা কত কাল পূর্ব্বে ভক্ত রামপ্রসাদও ৺মায়ের কৃপায় অনুভব করিতে পারিয়াই তুচ্ছ সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ৺মায়ের নামে আত্মহারা হইয়াছিলেন।

শিষ্য। গুরুদেব, কোন কোন সময় সাধনাকালে বোধ হয়, যেন পিপীলিকার মত কিছু ‘সুড়্ সুড়্’ করিয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া উঠিতেছে; তখন চুলকাইতে ইচ্ছা হয়। ইহা কি?

গুরু। বৎস, সুষুম্না-মার্গদ্বারা কুণ্ডলিনীশক্তির উত্থানকালে কখন

কখন এইরূপ অনুভব হয়; কুণ্ডলিনীর এই উত্থানকে পিপীলিকা-গতি কহে। যোগশিখোপনিষদে আছে,—

"পিপীলিকায়াং লগ্নায়াং কণ্ডুস্তত্র প্রবর্ত্ততে।
সুষুম্নায়াং তথাভ্যাসাৎ সততং বায়ুনা ভবেৎ॥"

অর্থ। পিপীলিকা শরীরে হাঁটিলে যেমন সুড়্সুড়ি অনুভূত হয় ও চুলকাইতে ইচ্ছা হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদা অভ্যাসবশতঃ প্রাণবায়ু (কুণ্ডলিনী-শক্তি) সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকিলে এইরূপ সুড়্সুড়ি অনুভূত হয় ও চুলকাইতে ইচ্ছা হয়।

পিপীলিকাগতি, সর্পগতি, ভেকগতি ও পক্ষিগতি, এই চারিপ্রকার গতিতে কুণ্ডলিনী চলেন। এখানে সেসব কথা বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন দেখিতেছি-না; ক্রমশঃ তোমার যখন যাহা উপলব্ধি হইবে, তখন তাহা নিজেই বুঝিতে পারিবে, অথবা তখন আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝাইয়া দিব।

শিষ্য। গুরুদেব, একমাত্র মন্ত্রজপদ্বারাই যে, আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি হয়, তাহা এখন আপনার কৃপায় নিজে বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ সরল যোগপথের কথা কাহারও মুখে শুনি নাই, কিম্বা কোন গ্রন্থে পাঠ করি নাই। আমরা ভাগ্যবান্ বলিয়াই ঈশ্বর আপনার ন্যায় সদ্গুরু মিলাইয়া দিয়াছেন। দুর্ব্বল কলির জীবের পক্ষে এই নাম-সাধন অপেক্ষা সহজ সাধন আর কি হইতে পারে? পুরাণে আছে—"কলৌ কেশবকীর্ত্তনাৎ।" পড়িয়াছি—"কলৌ জপাৎ সিদ্ধিঃ।"

বৃহৎ নারদীয়ে আছে,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

পাতঞ্জল যোগসূত্রে পাইয়াছি—"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।" অর্থাৎ তাঁহার নাম জপ ও তদর্থ চিন্তা করাই সাধনার মূল। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥"

অর্থ। অপ্রমত্তচিত্তে প্রণবরূপ ধনুতে মনরূপ শর যোজনা করিয়া ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যবেধ করিতে হইবে; এবং শরাগ্রভাগ যেমন লক্ষ্যবস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধকের মনও ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে লীন হইয়া থাকিবে।

গুরুদেব! আজ নিজ জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলাম। পরমদয়াল ভগবান্ দুর্ব্বল কলির জীবের জন্য এই জপযজ্ঞ বিতরণার্থ আপনাকে পাঠাইয়াছেন, যে জপযজ্ঞের ফলে পরমজ্ঞান ও পরমপ্রেম লাভ করিয়া জীব ধন্য হইয়া যাইবে। শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞই আমি—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি।" [গীতা]

গুরুদেব! নাম শুনিয়াই ত আমরা বস্তু চিনিয়া থাকি,—নাম ধরিয়াই যে বস্তু লাভ করি। এইজন্যই নাম ও নামী অভেদ। নাম বা শব্দব্রহ্মকে ভেদ করিয়াই যে, নামরূপাতীত পরব্রহ্মে পৌঁছিতে পারা যায়। পিতঃ, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নামে রুচি ও আপনার শ্রীপাদপদ্মে অচলা ভক্তি থাকে।

গুরু। বৎস! সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ ও পূজামধ্যে জপই শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। দেখ, যদ্যপি যাগযজ্ঞ শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধর্ম্ম, তথাপি পশুহত্যাজনিত পাপমিশ্রণহেতু অবিশুদ্ধিযুক্ত। এইজন্যই যজ্ঞফলে যে স্বর্গলাভ হয়, তাহাতে অবিমিশ্র সুখলাভ হয় না;—সেখানেও একে অপরের

বিশেষ বিশেষ গুণ বা সৌভাগ্যদর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত ও দুঃখপ্রাপ্ত হয়। পূজার্চ্চনায়ও পুষ্পপত্রাদিচয়নদ্বারা প্রাণিপীড়নজনিত পাপ স্পর্শে। তন্ত্রে এইরূপ পূজাদিকে 'পশ্বাচার' বলে। দিব্যভাবের সাধনা—যোগযুক্ত জপ। এই জপযজ্ঞ বা পূজায় কোনরূপ হিংসা নাই, ইহা কেবল প্রেমের সাধনা; প্রাণ, মন ও জীবন দিয়া কেবল সেই প্রিয়তমকে ডাকিতে হয়। প্রাণের বস্তুকে প্রাণ দিয়াই ডাকিতে হইবে,—পরের প্রাণ দিয়া নহে, নিজের প্রাণ দিয়া,—নিজের প্রাণ ও মন এক করিয়া। কেবল সদ্‌গুরুর অভাবেই মানুষ ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নামকে হেলা করিয়া থাকে। নামের শক্তি গ্রহণের জন্যই গুরু করা, কেবল একটী মন্ত্র কানে শুনিবার জন্য নহে। ক্রীং, শ্রীং, রাম, হরি প্রভৃতি মন্ত্র ত পুস্তকেই আছে। যদি মন্ত্রলাভই উদ্দেশ্য হয়, তবে ত পুস্তক দেখিয়া নিজ রুচি অনুসারে একটী মন্ত্র বাছিয়া লইলেই হয়। অনেকে বলেন যে, রাশিচক্রাদি দ্বারা মন্ত্রবিচার করিয়া মন্ত্রগ্রহণ করিতে হয়। হইলই বা, তাহাতেই বা গুরুর প্রয়োজন কি? বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাও ত নিজেরাই করিয়া লইতে পারেন। গুরু-করণপক্ষে এই সবই বাস্তবিক উদ্দেশ্য নহে। গুরুকরণের উদ্দেশ্যই হইতেছে গুরুশক্তিসঞ্চারদ্বারা প্রাণশক্তির জাগরণ। ইহা না হইলে গুরুকরণই বৃথা।

আমাতে ও তোমাতে যেমন প্রাণ আছে, তদ্রূপ এই জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই, এমন কি একটী অক্ষরেও প্রাণ আছে। প্রাণই শক্তি বা কুণ্ডলিনী। এই শক্তির জাগরণ ভিন্ন কে কবে যোগ, জ্ঞান বা ভক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছে? এই কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণকেই বৈষ্ণবেরা রাধারাণীর কৃপা কহেন। রাধারাণীর কৃপা না হইলে ভাব, ভক্তি ও প্রেম হয় না। এই শক্তি গুরুকৃপায় জাগরিত হয়; তখন

নামজপ করিতে বসিলেই সাধকের অপূর্ব্ব অনুভূতি আইসে। এইজন্য ইহাকে 'নামশক্তি' বা 'মন্ত্রচৈতন্য'ও বলে। ৺গয়াধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তদীয় গুরু ঈশ্বরপুরী হইতে এইরূপ নামের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলিয়াছিলেন "গুরুদেব আমাকে বেদান্তে অনধিকারী দেখিয়া নামজপ করিতে বলিয়াছেন। তাই নামজপ করি এবং তাহা হইতেই হাসি, কান্না, নৃত্য, গীত ও শরীরকম্পাদি হয়; আমি আর কিছুই জানি না।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় আছে,—

"সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা কর সঙ্কীর্ত্তন॥
বেদান্ত-পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবুকের কর্ম্ম॥
প্রভাবে দেখিয়া তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেন এর কি কারণ॥
প্রভু কহে শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥
মূর্খ তুমি নাহি তব বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণনাম জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
এত বলি এই শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে॥

যথা বৃহন্নারদীয়ে—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অস্যার্থ—হরিনাম হরিনাম হরিনাম সার।
কলিযুগে ইহা বই গতি নাহি আর॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্তাইল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হইলাম উন্মত্ত।
হাসি কাঁদি নাচি গাই যেন মদমত্ত॥

* * *

"স্বেদ কম্প গদ্‌গদাশ্রু রোমাঞ্চ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও ৺গয়াধামে তদীয় গুরু ব্রহ্মানন্দ পরমহংস হইতে এইরূপ নামের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এই নামশক্তিবলে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সদা 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতেন ও ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন।

শিষ্য। গুরুদেব! আমাদেরও'ত নামজপ করিতে করিতে এইরূপ অশ্রু-কম্প-পুলকাদি হইয়া থাকে; কখন কখন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্যগীতাদি করিতে ইচ্ছা হয় এবং হাসিকান্নাদিও আসে; কখনও খা খুব ঘর্ম্ম হয়! তবে'ত দেখিতেছি মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের ভিতরে যে শক্তি খেলা করিয়াছে, আপনার কৃপায় আমরা অধম হইয়াও সেই শক্তিরই অধিকারী হইয়াছি! স্পর্শমণি ছুঁইয়া আমরা যে একেবারে সোনা হইয়া গিয়াছি!

গুরু। বৎস, এসকলই জাগ্রত শক্তির কাজ। এইরূপ জাগ্রতশক্তিসম্পন্ন সাধকের সাধনাকালে এই সব লক্ষণ আপনা আপনি

প্রকাশ পায়। তোমাদের এই সাধনা নূতন নহে। যুগযুগান্তর হইতেই গুরুপরম্পরাক্রমে এই সাধনা চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরমভক্ত শিষ্য শ্রীমৎ রূপগোস্বামী তাঁহার "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ-ভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্‌ভাস্বরাখ্যয়া॥
নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।
হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা॥
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণাহিক্কাদয়োঽপি চ।
তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থাখ্যা দ্বিধোদিতাঃ॥"

অর্থ। এই সাধনায় চিত্তস্থ ভাবের ব্যঞ্জক এই সকল বাহ্যক্রিয়ার অনুভব হয়,—নৃত্য, গীত, ভূমিতে লুণ্ঠন, উচ্চ রব, শরীরের মোড়ামুড়ি, হুঙ্কার, হাইতোলা, দীর্ঘশ্বাস, লোকের নিন্দাপ্রশংসার প্রতি উপেক্ষাভাব, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা, হিক্কা, শীতবোধ ও হস্তপদাদির ক্ষেপণ ইত্যাদি।

উক্ত গ্রন্থে অন্যত্র—

"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভট।
প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্॥
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী।
তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ॥
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থ। [এই সাধনে নামজপ করিতে করিতে] চিত্ত সত্ত্বস্থ হইয়া প্রাণে লীন হয়; প্রাণ বিবিধ আভ্যন্তরিক ক্রিয়াশক্তির বিকাশদ্বারা দেহকে বিশেষরূপে ক্ষোভিত করিয়া থাকে, তখন ভক্ত সাধকের দেহে

ঐ স্তম্ভাদি ভাবসমূহ প্রকাশ পায়, যথা—স্তম্ভ (স্তম্ভের ন্যায় জড়বৎ দেহস্থিতি), স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ (কণ্ঠস্বরের নানারূপ বিকৃতি), কম্প, শরীরের বর্ণবিকৃতি, অশ্রু, নিদ্রা, এই আটটী সাত্ত্বিক ভাববিকৃতি।

শিষ্য। গুরুদেব! নাম-জপদ্বারা এইরূপ স্বেদাশ্রু-প্রলয়াদি ভাবসমূহ কেন আইসে?

গুরু। বৎস, শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার ঐ গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"চত্বারি ক্ষ্মাদি ভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে।
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্ব্বতঃ॥
স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুং জলাশ্রয়ঃ।
তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ॥
স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দ-মধ্যতীব্রত্ব-ভেদভাক্।
রোমাঞ্চ-কম্প-বৈস্বর্য্যাণ্যত্র ত্রীণি তনোত্যসৌ॥"

অর্থ। প্রাণ দেহমধ্যে কখন বা পৃথ্বী, জল, তেজ ও আকাশ, এই ভূতচতুষ্টয়ের কোন একটীকে অবলম্বন করিয়া থাকে, আর কখনও বা স্বপ্রধান হইয়া অর্থাৎ বায়ুকে অবলম্বন করিয়া দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করে। প্রাণ যখন ভূমিকে অবলম্বন করিয়া থাকে তখন স্তম্ভভাব, জলাশ্রিত হইলে অশ্রুপাত (ক্রন্দন), তেজঃস্থিত হইলে স্বেদ ও বর্ণবিকার এবং আকাশাশ্রিত হইলে প্রলয় (মূর্চ্ছা, তন্দ্রা বা নিদ্রাভাব) প্রকাশ করে। আর যখন প্রাণ স্বস্থ (স্বরূপে অর্থাৎ বায়ুতে স্থিত) হয়, তখন মন্দ, মধ্য ও তীব্রভেদে যথাক্রমে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরবিক্রিয়া এই ত্রিবিধ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

আমাদের দেহস্থ মূলাধার-সাধিষ্ঠানাদি পঞ্চ চক্র পৃথ্বীজলাদি পঞ্চ

মহাভূতের স্থান ;—মূলাধারে পৃথ্বীতত্ত্ব, সাধিষ্ঠানে জলতত্ত্ব, মণিপূরে তেজস্তত্ত্ব, অনাহতে বায়ুতত্ত্ব এবং বিশুদ্ধচক্রে আকাশতত্ত্ব বর্ত্তমান। প্রাণের পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে আশ্রয় করিয়া থাকার যে কথা বলা হইল, তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রাণ যখন মূলাধারে থাকে তখন পৃথ্বীকে, যখন সাধিষ্ঠানে অবস্থান করে তখন জলতত্ত্বকে, এইরূপে মণিপূর, অনাহত ও বিশুদ্ধচক্রে অবস্থানকালে যথাক্রমে তেজঃ, বায়ু ও আকাশকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপে প্রাণ যখন যে চক্রে অবস্থান করে, তখন তত্তৎচক্রস্থ ভূত-তত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ষট্‌চক্র-বর্ণনাকালে তাহা তুমি বিশেষভাবে জানিতে পারিবে।

বৎস! আমাদের এই স্বাভাবিক সাধনদ্বারা আপনা আপনি এই যে লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়, কৃত্রিম অর্থাৎ আয়াস বা চেষ্টাসাধ্য প্রাণায়াম দ্বারাও এই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। লিঙ্গপুরাণে অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে ত্রিবিধ প্রাণায়ামের ফল বর্ণনা করিয়া, পরে উত্তমোত্তম (সর্ব্বোত্তম) প্রাণায়ামের যে ফল বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।—

"নীচো দ্বাদশমাত্রস্তু উদ্বাতো দ্বাদশঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমস্তু দ্বিরুদ্বাতশ্চতুর্ব্বিংশতিমাত্রকঃ॥
মুখ্যস্তু যস্ত্রিরুদ্বাতঃ ষট্‌ত্রিংশমাত্র উচ্যতে।
প্রস্বেদ-কম্পনোত্থানজনকশ্চ যথাক্রমম্॥
আনন্দোদ্ভবযোগার্থং নিদ্রাঘূর্ণিস্তথৈবচ।
রোমাঞ্চধ্বনি সংবিদ্ধঃ স্বাঙ্গমোটনকম্পনম্॥
ভ্রমণং স্বেদজং ন্যাসং সংবিন্মূর্চ্ছা ভবেদ্‌যদা।
তদোত্তমোত্তমঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামঃ সুশোভনঃ॥"

অর্থ। [নীচ (অধম), মধ্যম ও মুখ্য (উত্তম) ভেদে যে ত্রিবিধ

প্রাণায়াম আছে, তন্মধ্যে] নীচ প্রাণায়াম দ্বাদশমাত্রা, অর্থাৎ উহাতে দ্বাদশমাত্রায় উদ্ঘাত বা পূরক করিতে হয়; ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি মাত্রায় পূরক করিলে মধ্যম প্রাণায়াম হয়; আর ত্রিগুণ অর্থাৎ ষট্‌ত্রিংশমাত্রায় পূরকদ্বারা মুখ্য (উত্তম) প্রাণায়াম সাধিত হয়। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম যথাক্রমে প্রস্বেদ, কম্প ও উত্থানজনক, অর্থাৎ অধম-প্রাণায়ামদ্বারা ঘর্ম্ম, মধ্যম-প্রাণায়ামদ্বারা কম্প ও উত্তম-প্রাণায়াম দ্বারা ঊর্দ্ধে উত্থান হয়। এই উত্তম-প্রাণায়াম হইতেও উত্তম যে প্রাণায়াম, তাহাতে যোগজন্য আনন্দের উৎপত্তি, নিদ্রা, ঘূর্ণি, রোমাঞ্চ, কণ্ঠ হইতে বিবিধ ধ্বনিপ্রকাশ, অঙ্গের গোড়ামুড়িরূপ কম্পন, স্বীয় অঙ্গের নানাপ্রকার ভ্রমণ বা সঞ্চালন ও তদ্দ্বারা স্বেদসহযোগে দেহের ক্লেদত্যাগ এবং সংবিন্মূর্চ্ছা (অর্থাৎ আভ্যন্তরিক অনুভূতিযুক্ত মূর্চ্ছিতভাব) প্রকাশ পায়; এই সকল লক্ষণযুক্ত যে প্রাণায়াম তাহাই উত্তমোত্তম (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) প্রাণায়াম বলিয়া কথিত।

এইরূপে, দেখা যাইতেছে যে, শক্তিপুটিত-নামজপরূপ সাধনাদ্বারা সাধকের দেহে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, এখানে অস্বাভাবিক প্রাণায়াম অভ্যাসেরও সেই সকল ফলই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উভয় প্রকার সাধনেই একই প্রকার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৎস, অস্বাভাবিক ভাবে, বিশেষ ক্লেশস্বীকারপূর্ব্বক যে সকল ফল লাভ করা যায়, তাহা যদি অনায়াসে লাভ করিবার সহজ (স্বাভাবিক) পন্থা পাওয়া যায়, তবে আর ঐরূপ কৃত্রিম পন্থা অনুসরণ করিবার আবশ্যকতা কি? বস্তুতঃ যে কোন উপায়ে কুণ্ডলিনী জাগরিত হইলেই সর্ব্বযোগলক্ষণ প্রকাশ পায়, কারণ একমাত্র কুণ্ডলিনীই সর্ব্বযোগসিদ্ধির মূল। হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে,—

"সশৈল-বনধাতৃণাং যথাধারোঽহিনায়কঃ।
সর্ব্বেষাং যোগতন্ত্রাণাং তথাধারা হি কুণ্ডলী॥"

অর্থ। যেমন অনন্ত-নাগ বাসুকী পর্ব্বতকাননসমন্বিতা ধরিত্রীর আধার, সেইরূপ সর্পাকারা কুণ্ডলিনীই সর্ব্বযোগ-প্রণালীসমূহের আধার বা আশ্রয় (অর্থাৎ সাধক যে প্রণালীতে যোগ-সাধন করুক, কুণ্ডলিনী-জাগরণ হইলেই তাহার সিদ্ধিলাভের পথ প্রশস্ত হয়, নতুবা সিদ্ধি সুদূরপরাহত)।

সিদ্ধগুরু কর্ত্তৃক শক্তিসঞ্চারদ্বারা সহজেই কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া থাকে এবং তখন বিনা আয়াসে আপনা আপনিই যোগলক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যাহারা এই সহজ যোগপথ প্রাপ্ত না হয়, তাহাদিগকেই কুণ্ডলিনী-জাগরণের জন্য অস্বাভাবিক প্রাণায়ামাদিরূপ কৃত্রিম পন্থার অনুসরণ করিতে হয়; কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যবশে সিদ্ধ-গুরুকৃপা লাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করিতে হয় না। বৎস, তোমরা প্রাক্তন সুকৃতির বশে যে সিদ্ধ (স্বাভাবিক) পথ প্রাপ্ত হইয়াছ, অবহিতচিত্তে তাহাতেই লাগিয়া থাক এবং অধ্যব-সায়ের সহিত সাধনা করিতে থাক; ইহা হইতেই সর্ব্বযোগফল লাভ করিয়া পরিশেষে কৈবল্যরূপ পরা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। কুলার্ণব-তন্ত্রে আছে—

"বেধদীক্ষাকরো লোকে শ্রীগুরুর্দুর্ল্লভঃ প্রিয়ে।
শিষ্যোঽপি দুর্ল্লভস্তাদৃক্ পুণ্যযোগেন লভ্যতে॥"

অর্থ। [শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন] হে প্রিয়ে! এই লোকে বেধদীক্ষা-দাতা (শক্তিসঞ্চারকারী) গুরু দুর্ল্লভ, আর এইরূপ দীক্ষার অধিকারী শিষ্যও দুর্ল্লভ; কেবল পূর্ব্বপুণ্যপ্রভাবেই এইরূপ গুরুলাভ হয়।

বৎস, এইরূপ গুরুলাভ হইলেই, তাঁহার কৃপায় কুণ্ডলিনীশক্তির

জাগরণদ্বারা এই স্বাভাবিক যোগপথ লাভ হয়। গুরুকৃপায়, একমাত্র ভক্তিভাবে নাম বা মন্ত্রসাধনদ্বারা, যদি সর্ব্বযোগফল লাভ হয়, তবে কৃত্রিমভাবে মন্ত্র-হঠাদি যোগসাধন করিবার আবশ্যকতা কি? এইরূপ সদ্‌গুরুপ্রাপ্তি সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে ঘটে না বলিয়াই, যোগের কথা শুনিলেই লোকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু এইরূপ যোগ প্রাপ্ত হইলে আতঙ্কের কিছুই নাই, কারণ এই পন্থায় অন্তর্গুরুই অন্তরে থাকিয়া আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি-সম্বলিত কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানাদিরূপ সর্ব্বযোগ শিক্ষা দেন। এই যোগ মুখে প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে, কেবল শিষ্য গুরুকৃপায় অন্তরে ইহা অনুভব করেন। এই সাধনার মূলভিত্তি ভক্তি; ভক্তি হইতে যোগ ও তাহা হইতে পরম জ্ঞান লাভ হয়। এই জ্ঞানদ্বারাই সাধক আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকেন, ইহাই সাধকের পরম পুরুষার্থ।

শিষ্য। পিতঃ! আপনার কৃপায় আমার অনেক রকম আসন ও মুদ্রা অনায়াসে হইয়াছে। এইগুলি কেন হয়—ইহাদের দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়? ইহাদের সবগুলির নামও জানি না।

গুরু। বৎস, তোমার যে সকল আসন ও মুদ্রা হইয়াছে, তাহাদের লক্ষণ বলিয়া যাও; আমি তোমাকে উহাদের নাম ও গুণ বলিয়া দিতেছি।

শিষ্য। কোন কোন সময় এমন হয় যে, বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পদ রাখিয়া বসিলাম; এবং পরে হস্তদ্বয়দ্বারা পরস্পর আড়াআড়ি ভাবে পৃষ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া, দক্ষিণ হস্তদ্বারা বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও বাম হস্তদ্বারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে ইচ্ছা হওয়ায়, সেই ভাবেই ধরিয়া বসিলাম। ইহা কি আসন, গুরুদেব?

গুরু। ইহাই 'পদ্মাসন'; উরুদ্বয়ের উপর পদদ্বয় রাখিয়া বসার নাম 'মুক্ত পদ্মাসন', আর মুক্ত পদ্মাসনে স্থিত হইয়া ঐরূপে হস্তদ্বয়দ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ধরিয়া বসার নাম 'বদ্ধ পদ্মাসন'। পদ্মাসন অভ্যাসদ্বারা সমস্ত ব্যাধি দূর হয়, এবং প্রাণবায়ু শীঘ্রই সরলভাবে চালিত হয়।

শিষ্য। কোন সময় বা গুহ্য ও উপস্থের মধ্যস্থানে বাম চরণের গুল্‌ফদ্বারা চাপিয়া, দক্ষিণ চরণের গুল্‌ফদ্বারা উপস্থের উপরিভাগকে চাপিয়া বসিলাম, এবং হৃদয়ে চিবুক সংস্থাপনপূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়া জপ করিতে লাগিলাম।

গুরু। বৎস, ইহাই 'সিদ্ধাসন'। সকল আসনের মধ্যে এই আসনই শ্রেষ্ঠ। এই সিদ্ধাসনদ্বারা অনেক সিদ্ধযোগী সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই আসনের অভ্যাসবলে বিনা আয়াসে মূলবন্ধ, উড্ডীয়ানবন্ধ ও জালন্ধরবন্ধ, এই বন্ধত্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা যোগের উন্মনী দশা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিষ্য। জানু (জঙ্ঘা) ও উরুর মধ্যস্থলে পাদতলদ্বয় স্থাপনপূর্ব্বক হাঁটু পাতিয়া উপবেশন করিলাম।

গুরু। এই আসনের নাম 'স্বস্তিকাসন'। ইহাকে 'সুখাসন'ও কহে, যেহেতু ইহা দুঃখরাশি বিদূরিত করে এবং শরীর ও মনকে সুস্থির করে। ইহাদ্বারা অচিরে বায়ুসিদ্ধি হয়।

শিষ্য। উভয় পদ দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে প্রসারণ করিলাম এবং হস্তযুগলদ্বারা পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ধারণপূর্ব্বক জঙ্ঘাদ্বয়ের মাঝখানে মাথা রাখিয়া জপ করিতে লাগিলাম।

গুরু। ইহা 'পশ্চিমোত্তান' আসন; ইহাকে 'উগ্রাসন'ও কহে। এই আসনদ্বারা উদরের অগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের জড়তা বা অবসাদ দূর হয়, সত্বর বায়ুসিদ্ধি হয় এবং দুঃখরাশি বিদূরিত হয়।

ইহাদ্বারা শীঘ্র প্রাণবায়ু পশ্চিম পথে অর্থাৎ সুষুম্নায় গমন করে বলিয়া ইহাকে 'পশ্চিমোত্তান' আসন কহে।

শিষ্য। এক পদ পশ্চাৎ দিকে রাখিয়া তাহার উরুর উপর অন্য পদ স্থাপনপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম।

গুরু। বৎস, ইহাকে 'বীরাসন' বলে। * এই আসনদ্বারা শরীরের রস ও বাত দূরীভূত হয় এবং অর্শাদি গুহ্যরোগেরও উপশম হয়।

শিষ্য। অঙ্গুষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত অধোভাগ ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক উভয় করতলদ্বারা মাটীতে ভর করিয়া সর্পের ন্যায় মাথা ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া অবস্থান করিলাম।

গুরু। ইহাকে 'ভুজঙ্গাসন' কহে, এই আসনদ্বারা শীঘ্র কুণ্ডলিনী-শক্তি উত্থিত হয় এবং দিন দিন জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও রোগ নষ্ট হয়।

শিষ্য। কোন কোন সময় শবের মত চিৎ হইয়া অবস্থানপূর্ব্বক জপ করিতে থাকি, তাহাতে বেশ আরামবোধ হয়।

গুরু। ইহাকে 'শবাসন' কহে। যোগসাধনদ্বারা যে পরিশ্রম হয়, তাহা এই শবাসনদ্বারা অপনোদিত হয়, এবং চিত্ত বিশ্রামসুখ লাভ করে।

শিষ্য। গুরুদেব, কখন কখন পাদগুল্‌ফদ্বারা গুহ্যমূল পীড়িত হওয়ায় গুহ্য সঙ্কুচিত হয়, এবং অপানবায়ু যেন ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইতে থাকে। এই ক্রিয়াকে কি বলে?

গুরু। ইহা এক প্রকার মুদ্রা—ইহাকে 'মূলবন্ধ' মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা জরাদিনাশক; ইহাদ্বারা প্রাণ ও অপানের সমতা হয়। সাধক এই মুদ্রাদ্বারা পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া প্রাণবায়ু জয় করতঃ শূন্যে

* বীরাসন অন্য প্রকারেও হয়। উভয় পদ গুটাইয়া পশ্চাৎ দিকে রাখিয়া, সেই পদদ্বয়োপরি উপবেশন করাকেও বীরাসন বলে।

অবস্থান করিতে সমর্থ হন। এই মুদ্রার সাহায্যেই 'দাদুরী' গতি হয়, অর্থাৎ সাধক পদ্মাসনে আসীন থাকিয়া ভেকের মত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লাফাইয়া যাইতে সমর্থ হন।

শিষ্য। কখন বা প্রাণবায়ুর রেচনপূর্ব্বক উদর খালি করিয়া পশ্চাদ্দিকে নাভিসঙ্কোচন হইয়া থাকে; তখন বোধ হয়, যেন নাভির নিম্নস্থ বায়ু আকৃষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছে।

গুরু। ইহাকে 'উড্ডীয়ানবন্ধ' মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা মৃত্যুরূপ করীর পক্ষে সিংহস্বরূপ। এই মুদ্রাদ্বারা নাড়ীশুদ্ধি ও বায়ুশুদ্ধি হয়; নাড়ীশুদ্ধি হওয়ায় জঠরাগ্নি বৃদ্ধি, আর বায়ুশুদ্ধি হওয়ায় মনের চঞ্চলতা নাশ হয়।

শিষ্য। আবার কখন কখন কণ্ঠ-সঙ্কোচনপূর্ব্বক হৃদয়ে চিবুক স্থাপন করিয়া জপ করিতে থাকি। ইহা কি?

গুরু। ইহা 'জালন্ধরবন্ধ' মুদ্রা। প্রাণিগণের সহস্রার হইতে ক্ষরিত সুধাকে নাভিচক্রস্থ সূর্য্য বা অগ্নি শোষণ করিয়া থাকে; কিন্তু এই জালন্ধর মুদ্রার অনুষ্ঠান দ্বারা সুধাক্ষরণের পথ রুদ্ধ হওয়ায় অগ্নি তাহা শোষণ করিতে পারে না। এই মুদ্রাসাহায্যে যোগীর মন শীঘ্র মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। কখন কখন বামপদের গুল্ফদ্বারা গুহ্যমূল সংপীড়ন ও দক্ষিণ চরণ প্রসারণপূর্ব্বক, হস্তযুগলদ্বারা ঐ প্রসারিত পদের অঙ্গুলিসমূহ দৃঢ়রূপে ধারণ ও বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে মস্তক রক্ষা করিয়া জপ করিতে থাকি। আবার কখন কখন ইহার বিপরীত ভাবেও হয়।

গুরু। বৎস, ইহাকে 'মহামুদ্রা' কহে। এই মুদ্রাদ্বারা কুণ্ডলিনী সন্তপ্ত হইয়া প্রাণবায়ুর সহিত সুষুম্নামার্গে প্রবেশ করেন; ইহাদ্বারা সমস্ত নাড়ীর চালন ও বিন্দুধারণ হয়; শরীরের জড়তা নষ্ট হয়;

শারীরিক পীড়ার শান্তি, উদরানল বৃদ্ধি, দেহের সুনির্ম্মল কান্তি, বার্দ্ধক্য-লক্ষণ-বিদূরণ এবং ইন্দ্রিয়সংযম হইয়া থাকে ; এই মুদ্রার অভ্যাসদ্বারা ক্ষয়, কুষ্ঠ, অর্শ ও ভগন্দরাদি গুহ্যরোগ, গুল্ম ও অজীর্ণাদি দোষ নষ্ট হয়।

শিষ্য। এইরূপ মহামুদ্রা অনুষ্ঠানের পর, আবার দক্ষিণ চরণ গুটাইয়া আসিয়া বাম উরুর উপর স্থাপিত হয় এবং উদরে বায়ু পূরণ করিয়া জালন্ধরবন্ধের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কুম্ভক সহকারে জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বায়ুরেচন হইতে থাকে।

গুরু। ইহার নাম 'মহাবন্ধ' মুদ্রা। এই মুদ্রার অভ্যাসদ্বারা প্রাণ-বায়ু সুষুম্নার মধ্যে প্রবেশ করে, শরীরের পুষ্টি হয় এবং অস্থিপঞ্জর দৃঢ়বদ্ধ হয়।

শিষ্য। পিতঃ! পরে মহাবন্ধ অবস্থায় বসিয়াই প্রাণবায়ুকে বাহিরে রাখিয়া (পূরক না করিয়া), উড্ডীয়ানবন্ধপূর্ব্বক বহিঃকুম্ভক হয়। কখন বা হস্তযুগলদ্বারা কুক্ষির দুই পার্শ্বে মৃদু মৃদু তাড়ন করিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। ইহাকে 'মহাবেধ' মুদ্রা কহে। বৎস, এই মুদ্রাদ্বারা প্রাণ ইড়া ও পিঙ্গলাকে বিসর্জ্জন করিয়া সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয় এবং ইহাদ্বারা গ্রন্থিত্রয় ভেদ হইয়া যায়, অনন্তর অবহেলে কুণ্ডলিনীর সহস্রারে যাতায়াত হইতে থাকে। ইহাদ্বারা বায়ুসিদ্ধি ও জরাদি ধ্বংস হয়।

শিষ্য। কোন কোন সময় ভূতলে করতলদ্বয় উত্তানভাবে স্থাপন-পূর্ব্বক তদুপরি মস্তক রক্ষা করিয়া পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করি এবং ঐ অবস্থায় কুম্ভক হইয়া নামজপ হইতে থাকে! ইহা ত বড়ই অদ্ভুত! ইহার নাম কি, গুরুদেব?

গুরু। বৎস, ইহার নাম 'বিপরীতকরণী' মুদ্রা। এই মুদ্রাদ্বারা জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয়। শরীরের বলিপলিতাদি বিদূরিত হয়। মস্তকে (তালুতে) চন্দ্র ও নাভিতে সূর্য্য আছে ; ঐ চন্দ্রবিগলিত-সুধা সূর্য্য

সদাই আকর্ষণ ও শোষণ করিতেছে; এই হেতু মনুষ্যের শরীর শীঘ্র শীঘ্র জরাদি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঐ মুদ্রার প্রসাদে দীর্ঘকাল যুবার ন্যায় থাকা যায়।

শিষ্য। আবার কখন বা ঐরূপ বিপরীতকরণী অবস্থায়ই করতল-দ্বয় নিম্নতান হইয়া যায় এবং হস্তযুগলের উপর ভর করিয়া মস্তক শূন্যে উঠিয়া থাকে।

গুরু। ইহাকেই ঘেরণ্ড-সংহিতায় 'বজ্রোলী' মুদ্রা বলা হইয়াছে। এই মুদ্রার প্রসাদে সাধকের বিন্দুসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইয়া থাকে অর্থাৎ বিন্দুক্ষরণ হয় না, বিন্দুধারণ করিবার সামর্থ্য লাভ হয়। ইহা সাধককে দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার কৃপায় আরও অনেক রকম ক্রিয়া হয় কিন্তু সে সকল মনে পড়িতেছে না। চেষ্টা করিলে কোন কোনটী হয় ত মনে আসিতে পারে।

গুরু। বৎস, চেষ্টা করিয়া যাহা যাহা তোমার মনে আসে, বল। আমি সে সকলেরই নাম ও গুণ বলিয়া দিব।

শিষ্য। জপ করিতে করিতে (১) মুখ কিঞ্চিৎ বিস্তারপূর্ব্বক গল-দেশদ্বারা বায়ু পান করিতে থাকি, (২) কোন সময় ঊর্দ্ধজিহ্ব হইয়া কুম্ভকে অবস্থান করি, (৩) কোন কোন সময় কাকের মত ঠোঁট করিয়া বায়ু আকর্ষণ করিয়া থাকি।

গুরু। প্রথমোক্ত ক্রিয়াটী 'ভুজঙ্গিনী মুদ্রা'; ইহাদ্বারা জরামৃত্যুর নাশ হয়। দ্বিতীয় ক্রিয়াটী 'নভোমুদ্রা'; ইহাদ্বারা যোগীদের রোগনাশ হয়। এই মুদ্রাভ্যাসদ্বারা ক্রমশঃ জিহ্বা আলজিহ্বার গহ্বরে প্রবেশ করাইতে পারা যায় এবং পরে 'খেচরী' মুদ্রার ক্রিয়া হইতে থাকে। তৃতীয় ক্রিয়াটী 'কাকী'মুদ্রা, কেহ কেহ ইহাকে 'শীতলী' মুদ্রাও

কহেন ; ইহাদ্বারা কাকের ন্যায় দীর্ঘজীবী হওয়া যায় ; এই মুদ্রা রক্ত-পরিষ্কারক, এবং জ্বরপ্লীহাদি ও গুল্ম-নাশক।

শিষ্য। পিতঃ ! কোন দিন জপ করিতে করিতে কপাল ভয়ানক টন্‌টন্ করিতে থাকে এবং পরে উর্দ্ধনেত্র হইয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া থাকিলে বেশ আরাম বোধ হয়, আর মনটাও যেন স্থির হইয়া আইসে। ইহা কি মুদ্রা ?

গুরু। বৎস, ইহা 'শাম্ভবী' মুদ্রা ; এই মুদ্রাদ্বারা যোগী শম্ভুসদৃশ হন। এই মুদ্রাদ্বারা মন ভ্রূমধ্যে স্থির হইলে আত্মচৈতন্যে স্থিতিলাভ হয়।

শিষ্য। কোন কোন সময় জপ করিতে করিতে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়দ্বারা কর্ণরন্ধ্রদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয়দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় এবং অন্যান্য অঙ্গুলীদ্বারা মুখ ও নাসিকা বন্ধ হইয়া থাকে। ইহা কি ?

গুরু। ঘেরণ্ড মুনি এই মুদ্রাকে 'যোনি' মুদ্রা এবং হঠযোগ-প্রদীপিকাকার স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র ইহাকে 'পরাঙ্‌মুখী' মুদ্রা নাম দিয়াছেন। এই মুদ্রাদ্বারা অনাহত নাদ সুস্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয় এবং জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মার দর্শন লাভ হয় ; এই আত্মজ্যোতির দর্শনদ্বারা সাধক নিষ্পাপ হন।

শিষ্য। গুরুদেব ! আপনার কৃপায় আসন ও মুদ্রাসমূহের উপ-যোগিতার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, শরীর ও মনকে সুস্থ ও শক্তিমান্ করিয়া তুলিবার জন্য যে সকল ক্রিয়া আবশ্যক, আমাদের এই সিদ্ধযোগসাধনে, সেই সকল ক্রিয়াই আপনা আপনি হইয়া থাকে ; বিনা প্রয়োজনে কিছুই হয় না। আমরা সময়ে সময়ে গুরুশক্তির উপর বিশ্বাস করিতে না পারার জন্যই দুঃখার্ণবে হাবুডুবু খাই। গুরুদত্ত নামের শক্তিতে বিবিধ আসন-মুদ্রাদি যোগক্রিয়াসমূহ আপনা আপনি

হয়, ইহা অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি! আমাদের ন্যায় কলির দুর্ব্বল জীবের পক্ষে এইরূপ সহজ সাধনাই শ্রেষ্ঠ। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার প্রদত্ত নাম-সাধনা অবিরাম করিতে পারি।

গুরু। বৎস! আমি তোমাদের প্রকৃতির অন্তর্ম্মুখের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি; এখন যতই সাধনা করিবে, ততই প্রকৃতি আপনা হইতেই পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে। এখন তোমাদের একমাত্র পুরুষকার গুরূপদেশমত সাধনা করা। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, অনবরত নামজপরূপ দাঁড় টানিতে থাকিবে। দাঁড় টানিলেই তরি গন্তব্য স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে এবং পথে কত বিচিত্র শোভা দেখিয়া—বিবিধ আনন্দজনক অনুভূতি লাভ করিয়া সুখী হইবে। কিন্তু পথের কোন দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া, দাঁড় টানা বন্ধ করিয়া, সেখানেই লাগিয়া থাকিও না; এগিয়ে যাও, ভাবনা কি? গুরু ত পিছনে হাল ধরিয়া বসিয়া আছেনই। গুরুশক্তিতে বিশ্বাস রাখিও এবং নির্ভর করিও।

শিষ্য। গুরুদেব! আরও কয়েক প্রকার আসন ও মুদ্রা হইতেছে তাহাও আপনাকে নিবেদন করিতেছি—সে সমস্তের নাম কি?

১। কোন সময় মুক্ত-পদ্মাসন করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকি এবং কোন সময় বা এই অবস্থায় থাকিয়াই চিৎ হইয়া থাকি।

২। কোন কোন সময় উপুড় হইয়া শুইয়া থাকি এবং তৎপরে ঐ অবস্থায়ই মস্তক উর্দ্ধদিকে উঠাইয়া পাদুটার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হস্তদ্বারা বলপূর্ব্বক ধরিয়া থাকি।

৩। কোন কোন সময় জপ করিতে করিতে পাদুখানি লম্বালম্বি ভাবে রাখি এবং তৎপরে চিবুক হৃদয়ে স্থাপনপূর্ব্বক শান্তভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকি এবং কখন কখন কাৎ হইয়া শুইয়া থাকি ও জপ করি।

৪। কখন বা চিৎ হইয়া শুইয়া থাকি এবং পরে পাদুখানি ঊর্দ্ধদিকে উঠাইয়া মাথা পর্য্যন্ত আনিয়া দুই হাতদ্বারা দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী জোর করিয়া ধরিয়া থাকি এবং

৫। কখন বা হাত দিয়াও ধরিতে হয় না, একেবারে মাটীতে যাইয়া পাদুখানি স্পর্শ করে। এইরূপ নানাপ্রকার অবস্থায় থাকিয়া জপাদি হয়। সে সমস্ত আপনাকে আর কত বলিব, সবই ত আপনার কৃপা।

গুরু। বৎস! তোমাকে পূর্ব্বেই একবার বলা হইয়াছে যে চৌরাশী লক্ষ যোনি ; চৌরাশী লক্ষ যোনির বসিবার প্রণালীও চৌরাশী লক্ষ প্রকার। প্রত্যেকটীকেই আসন বলা যায়। সে সমস্ত আসনের মধ্যে প্রধান প্রধান আসনাদির কথা আমরা বর্ত্তমান শাস্ত্রাদিতে পাই। অন্য সমস্তগুলি শাস্ত্রাদিতে পাই না বলিয়া মনে করিতে হইবে না যে তাহা কিছু নহে, কারণ অনেক শাস্ত্র আমাদের দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহা আছে তাহাও আমাদের জানা নাই বা জানিবার উপায়ও নাই। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র সাগরের মত অনন্ত, আবার আমাদের আয়ুঃও অল্প।

বৎস! যে সমস্ত আসনাদি হইতেছে সে সমস্তের নাম দিয়া কোন প্রয়োজন নাই ; যোগশাস্ত্রাদির সহিত যেগুলির ঐক্য হইতেছে তাহা জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট। মোটের উপর জানিয়া রাখ, স্বাভাবিক ভাবে তোমাদের যাহাই হইতেছে তাহা সবই ভাল। এই সমস্ত ক্রিয়াই শরীরকে গঠন করার জন্য। চাই—নির্ম্মল শান্তি। শরীর যে অবস্থায় থাকুক না কেন তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেবল লক্ষ্যবিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া জপ বা ধ্যান করিয়া যাইতে হইবে।

শিষ্য। পিতঃ! ব্রহ্মসূত্রে আছে 'আসীন সম্ভবাৎ' অর্থাৎ উপ-

বেশন করিয়াই জপ বা ধ্যানাদি করিবে। কিন্তু আমাদের ত কখন কাৎ, কখন চিৎ এবং কখন বা উপুড় হইয়া শুইয়া থাকিয়া জপ বা ধ্যান হয়। তাই সময় সময় মনে সংশয় হয় যে তবে কি শাস্ত্রের নীতি লঙ্ঘন করিতেছি! আপনার এত উপদেশ শুনিলাম তথাপি সামান্য বিষয়ে মনের সংশয় দূর হইতেছে না।

গুরু। হে পুত্র! সংশয় হইলেই বস্তুর নির্ণয় হয়। এক বিষয়ে নানাভাবে যত সংশয় উপস্থিত হইবে, ততই বস্তুটীর নির্ণয়-বিষয়ে দৃঢ়-বুদ্ধির উদয় হইবে। যাবৎ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার না হয় তাবৎ সম্পূর্ণরূপে সংশয় দূর হয় না। শ্রুতি তত্ত্বদর্শীর লক্ষণের কথা বলিয়াছেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

অর্থ। যিনি কার্য্যকারণাত্মক ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন তাঁহার হৃদয়গ্রন্থি (অহঙ্কার অর্থাৎ এই দেহে যে আমি বুদ্ধি তাহা) নষ্ট হইয়াছে, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়াছে এবং (প্রারব্ধকর্ম্ম ব্যতিরিক্ত) আগামী ও সঞ্চিত কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাক্ এখন তোমার মনের এই সংশয় দূর করিতেছি।

গুরুকৃপায় সর্ব্বযোগের আধারস্বরূপা মূলাধারস্থা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইলে আসন মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি অস্বাভাবিক ভাবে করিতে হয় না; তখন এই সমস্ত স্বাভাবিক ভাবে আপনা আপনি হইতে থাকে।

ত্রিবিধ উপায়ে এই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হয়; প্রথমতঃ যোগশাস্ত্রোক্ত আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামের অভ্যাসদ্বারা, দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধগুরুর কৃপাদ্বারা এবং তৃতীয়তঃ জন্মজন্মান্তরীন উর্জ্জিতা ভক্তিদ্বারা।

বৎস! দ্বিতীয় উপায়টী সকলের পক্ষে উত্তম ও সহজ। যাহাদের

গুরুকৃপায় অথবা জন্মান্তরীন উর্জ্জিতা ভক্তিদ্বারা এই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগে নাই তাহাদের পক্ষেই এই শক্তি উদ্বোধনের নিমিত্ত অস্বাভাবিক ভাবে আসনমুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ-দ্বারা এই স্বাভাবিক বা সহজ যোগ লাভ করিবার পূর্ব্বে যদি সাধক উপবেশন না করিয়া শুইয়া উপাসনা বা সাধনা করে তবে তমোগুণে অভিভূত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িতে পারে আশঙ্কা করিয়াই "আসীন সম্ভবাৎ" এই শাসন-বাক্য বলা হইয়াছে। কিন্তু সদ্‌গুরু-কৃপায় এই সহজ যোগ লাভ হইলে তখন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকে না; গুরু-শক্তির প্রেরণায় যখন যে অবস্থায় থাকিয়া জপ বা ধ্যান করিতে ইচ্ছা হয় সেই ভাবেই জপাদি করিবে, তাহাতেই শান্তি হইবে। প্রথম বিবৃতিতে সিদ্ধিমার্গ বর্ণনাকালে তোমাকে একবার এই বিষয় বিশদ-ভাবে বলা হইয়াছে, তজ্জন্য এখন আর বেশী কিছু বলিলাম না।

বৎস! ত্রিবিধ উপায়ে সাধকের কুণ্ডলিনীশক্তি-জাগরণরূপ সিদ্ধি-মার্গ লাভ হয় বলিয়া সাধককে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—সাধনসিদ্ধ সাধক, কৃপাসিদ্ধ সাধক ও হঠাৎ বা দৈবসিদ্ধ সাধক। স্বপ্ন-সিদ্ধ সাধক হঠাৎ বা দৈবসিদ্ধ সাধকের অন্তর্গত বলিয়া ইহাকে পৃথক্-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না।

(১) যম, নিয়ম, আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদি সাধনাদ্বারা যাহার কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগরিত করা হয় তাহাকে সাধনসিদ্ধ, (২) সদ্‌গুরু-কৃপায় যাহার কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হয় তাহাকে কৃপাসিদ্ধ এবং (৩) জন্মজন্মান্তরীন উর্জ্জিতা ভক্তিদ্বারা যাহার কুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধন হয় তাহাকে হঠাৎ বা দৈবসিদ্ধ বলা হয়। স্বপ্নে মহাপুরুষ বা দেবতা-দ্বারা শক্তি সঞ্চারিত হইলেও এই কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ হয়; ইহাকেও হঠাৎ বা দৈবসিদ্ধ বলা যায়। হে পুত্র! উদাহরণদ্বারা

তোমাকে বুঝাইতেছি—যেমন (১) তুমি বহু যত্ন করিয়া, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত চেষ্টাদ্বারা অর্থলাভ করিলে, সাধন-সিদ্ধ এইরূপ। (২) কোন ধনী বা রাজা তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যেন তোমাকে কিছু ধন বা সম্পত্তি দিয়া দিলেন; কৃপাসিদ্ধ এইরূপ এবং (৩) তুমি কোন রাস্তায় চলিতে চলিতে বা ঘরে বসিয়াই হঠাৎ যেন কিছু ধন পাইলে; হঠাৎ বা দৈবসিদ্ধ এইরূপ।

নবম বিবৃতি

শিষ্য। পিতঃ! আজকাল প্রায়ই নানারূপ শ্বাসের ক্রিয়া—শ্বাসের আগম, নির্গম ও রোধ হইতে থাকে; ইহাদ্বারা কি ফল লাভ হইবে?

গুরু। বৎস! এই ক্রিয়াকেই যোগশাস্ত্রে 'প্রাণায়াম' বলা হইয়াছে। পূরক, কুম্ভক ও রেচক ভেদে প্রাণায়ামের তিন অংশ। এই ক্রিয়াদ্বারা প্রাণসংযমন হয় বলিয়াই ইহার নাম 'প্রাণায়াম'। কুম্ভকদ্বারা প্রাণবায়ু স্থির হইলেই মন বা চিত্তও স্থিরীভাব ধারণ করে। প্রাণায়ামদ্বারা প্রথমে নাড়ীশুদ্ধি হয়। আমাদের গৃহস্থিত আবর্জ্জনারাশি যেমন সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা) দ্বারা পরিষ্কার করা হয়, তদ্রূপ দেহস্থিত নাড়ীসমূহের মল দূরীকরণ জন্য প্রাণায়ামই সম্মার্জ্জনী-সদৃশ। প্রাণায়ামদ্বারা নাড়ীসমূহ মলরহিত হইলে তন্মধ্যে প্রাণবায়ু স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং এইরূপ অভ্যাসের ফলে ক্রমে প্রাণের ও মনের চাঞ্চল্য দূরীভূত হইতে থাকে ও পরিণামে সাধকের উন্মনীভাব বা একাগ্র-চিত্ততা লাভ হয়।

পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে—

"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।"

অর্থ। প্রাণায়াম-সিদ্ধি হইলে যোগীর বিবেকজ্ঞানের আবরণ ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়।

ইন্দ্রজালসদৃশ মহামোহ প্রকাশশীল সত্ত্বগুণকে আবৃত করিয়া জীবকে অকার্য্যে নিযুক্ত করে। এই প্রকাশের আবরণরূপ কর্ম্মই সংসার-বন্ধনের হেতু। ইহা প্রাণায়াম অভ্যাসদ্বারা দুর্ব্বল হয় এবং প্রতিক্ষণই

ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণায়াম হইতে উৎকৃষ্টতর তপস্যা আর নাই, তদ্দ্বারা চিত্তমলসমূহ বিধৌত হয় ও জ্ঞান প্রকাশিত হয়। *

শিষ্য। গুরুদেব! সাধনকালে প্রাণায়ামে ও অঙ্গসঞ্চালনে বড়ই ঘর্ম্ম বাহির হয়, উহা কি তখনই মুছিয়া ফেলা উচিত?

গুরু। বৎস, সাধনকালে ঘর্ম্ম বাহির হইলে, সেই ঘর্ম্মদ্বারা তৈল-মর্দ্দনবৎ অঙ্গমর্দ্দন করিবে; এতদ্দ্বারা দেহের লঘুতা ও দৃঢ়তা লাভ হয়। †

শিষ্য। গুরুদেব! শ্বাসের ক্রিয়া বা প্রাণায়াম যখন নানাপ্রকারই হইয়া থাকে, তখন উহাদের অবশ্যই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাণায়ামদ্বারা বিভিন্ন প্রকার ফল লাভ হয় বলিয়াই মনে হয়। আজকাল কয়েকটী অদ্ভুত রকমের প্রাণায়াম হইতেছে, তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করিতেছি; আপনি কৃপাপূর্ব্বক উহাদের নাম ও ফল বলিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

গুরু। বৎস, অদ্ভুত কিছুই নাই। এই সিদ্ধ মহাযোগ সাধনদ্বারা যে সকল ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সে সকলই যোগশাস্ত্রের অন্তর্ভূত। কি

* "মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্য্যে নিযুঙ্‌ক্তে ইতি। তদস্য প্রকাশাবরণং কর্ম্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ দুর্ব্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ ক্ষীয়তে। তথা চোক্তং "তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ, ততো বিশুদ্ধির্মলানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।" [যোগসূত্র-ব্যাসভাষ্যম্]

† জলেন শ্রমজাতেন গাত্রমর্দ্দনমাচরেৎ।
দৃঢ়তা লঘুতা চৈব তেন গাত্রস্য জায়তে॥
[হঠযোগ-প্রদীপিকা]

কি প্রকার প্রাণায়াম হয়, বলিতে থাক ; আমি উহাদের নাম ও ফল বলিয়া দিতেছি।

শিষ্য। অদ্ভুত বলিতেছি এইজন্য যে, এতদিন আমাদের ধারণা ছিল নাক টিপাটিপি করিয়াই প্রাণায়াম সাধন করিতে হয়, কিন্তু এখন দেখিতেছি আমাদের এই প্রাণায়ামে নাক টিপাটিপি নাই, 'ফাপোর ফাপোর' বোধ নাই, অথচ নানাপ্রকার সুখকর কুম্ভকাদি হইতেছে! এইরূপ প্রাণায়ামে বড়ই আরামবোধ হয়।

গুরু। বৎস, প্রথম দিনই ত তোমাকে বলিয়াছি যে, শক্তিসঞ্চার হইলে একমাত্র মন্ত্রজপাদিদ্বারাই আসন-মুদ্রা-প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গসমূহ বিনা আয়াসে সাধিত হইতে থাকিবে। যাহাদের ভাগ্যে সদ্‌গুরু-লাভ ঘটে নাই, তাহারাই সহজ-সাধন-পথ-প্রাপ্তির অভাবে নাক টিপাটিপি করিয়া আয়াসসাধ্য প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করে। ঋগ্‌বেদ-ভাষ্যভূমিকায় আছে—

"বালবুদ্ধিভিরঙ্গুলাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিদ্রমবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈস্ত্যাজ্যঃ।"

অর্থ। সাধারণ বালবুদ্ধিবিশিষ্ট অজ্ঞ ব্যক্তিরা অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নাসিকাছিদ্র অবরোধ করিয়া যে প্রাণায়াম করিয়া থাকে, তাহা শিষ্টগণের পরিত্যজ্য, অর্থাৎ সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত বুধব্যক্তিগণ সেভাবে প্রাণায়াম করেন না।

সে যাহা হউক, তোমার কি কি প্রকার প্রাণায়াম হয় তাহা এখন ক্রমে ক্রমে বলিতে থাক।

শিষ্য। গুরুদেব! কোন কোন সময় কাকীমুদ্রা সহযোগে জিহ্বাদ্বারা বায়ু আকৃষ্ট হইয়া কুম্ভক হয় ও তৎপরে নাসিকাদ্বারা রেচন হয়।

গুরু। বৎস, ইহার নাম 'শীতলী' কুম্ভক। গোরক্ষ-সংহিতায় আছে—

"জিহ্বয়া বায়ুমাকৃষ্য উদরে পূরয়েচ্ছনৈঃ।
ক্ষণঞ্চ কুম্ভকং কৃত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ॥"

এই কুম্ভকের গুণ এই যে, ইহাদ্বারা অজীর্ণ, কফ ও পিত্তজনিত রোগসমূহ নষ্ট হয়। ঘেরণ্ড-সংহিতায় আছে—

"অজীর্ণং কফপিত্তঞ্চ নৈব দেহে প্রজায়তে।"

শিষ্য। যেমন লৌহকারের ভস্ত্রাযন্ত্রদ্বারা, অগ্নি-উদ্দীপনার্থ, বায়ু বেগে প্রবিষ্ট ও বহির্গত হইতে থাকে, কোন কোন সময় তদ্রূপ নাসাপুটে শ্বাসপ্রশ্বাস বেগে ভিতরে ও বাহিরে যাতায়াত করিতে থাকে।

গুরু। ইহাকে 'ভস্ত্রা' কুম্ভক কহে। গোরক্ষ-সংহিতায় আছে—

"ভস্ত্রেব লৌহকারাণাং যথা ক্রমেণ সংভ্রমেৎ।
ততো বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ॥"

এই কুম্ভক অভ্যস্ত হইলে কোন রোগ কিংবা ক্লেশ হইতে পারে না এবং দিন দিন স্বাস্থ্যলাভ হইতে থাকে। ঘেরণ্ড-সংহিতায় আছে—

"ন চ রোগং ন চ ক্লেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে।"

হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে,—

"বাতপিত্তশ্লেষ্মহরং শরীরাগ্নিবিবর্দ্ধনম্।
কুণ্ডলীবোধকং ক্ষিপ্রং পবনং সুখদং হিতম্।
ব্রহ্মনাড়ীমুখে সংস্থ-কফাদ্যর্গলনাশনম্॥
সম্যগ্ গাত্রসমুদ্ভূত-গ্রন্থিত্রয়বিভেদকম্।
বিশেষেণৈব কর্ত্তব্যং ভস্ত্রাখ্যং কুম্ভকং ত্বিদম্॥"

অর্থ। এই প্রকার কুম্ভকদ্বারা বাত, পিত্ত ও কফ নষ্ট হয়, দেহাগ্নি বর্দ্ধিত হয় এবং কুণ্ডলিনীশক্তি সত্বর প্রবুদ্ধ হয়; এই কুম্ভক পবিত্র, সুখকর ও হিতকর; ইহাদ্বারা ব্রহ্মনাড়ীর (সুষুম্নার) মুখস্থিত কফাদিরূপ অর্গল নাশপ্রাপ্ত হইয়া সুষুম্নাপথে কুণ্ডলিনীর উত্থানের সুবিধা

করিয়া দেয় এবং সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মাদি গ্রন্থিত্রয় ভেদ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়া এই ভস্ত্রা কুম্ভক বিশেষ ভাবে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। কোন সময় জিহ্বার দুই পার্শ্বদ্বারা বায়ু আকৃষ্ট হওয়ায় মুখে 'সীৎ' এইরূপ শব্দপূর্ব্বক পূরক হইয়া কুম্ভক হয় এবং পরে নাসাপুটদ্বারা রেচন হয়।

গুরু। ইহাকে 'সীৎকারী' কুম্ভক কহে। ইহা অভ্যাস করিলে দ্বিতীয় কামদেবের তুল্য দেহকান্তি হয়, এবং এতদ্দ্বারা নিদ্রা, আলস্য, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে,—

"সীৎকাং কুর্য্যাত্তথা বক্ত্রে প্রাণেনৈব বিজৃম্ভিকাম্।
এবমভ্যাসযোগেন কামদেবো দ্বিতীয়কঃ॥"

এবং "ন ক্ষুধা ন তৃষ্ণা নিদ্রা নৈবালস্যং প্রজায়তে"

শিষ্য। কখন কখন সবেগে ভ্রমরনাদবৎ শব্দ করিয়া পূরকপূর্ব্বক কুম্ভক হয়, এবং পরে আবার ঐরূপ ভ্রমরনাদবৎ শব্দ সহকারে রেচন হইতে থাকে। তখন মনটা যেন ঐ শব্দে একমুখী হয় এবং বেশ এক প্রকার আনন্দ অনুভূত হয়।

গুরু। বৎস, ইহা 'ভ্রামরী' কুম্ভক। হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে,—

"বেগাদ্‌ঘোষং পূরকং ভৃঙ্গনাদং
ভৃঙ্গনাদং রেচকং মন্দমন্দম্।
যোগীন্দ্রাণামেবমভ্যাসযোগা-
চ্চিত্তে জাতা কাচিদানন্দলীলা॥"

শিষ্য। কোন সময় মুখ বুজিয়া, নাসিকাদ্বারা, এমন ভাবে বায়ু আকর্ষিত হয় যে, বায়ু সশব্দে কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত সংলগ্ন হইতে থাকে, পরে কুম্ভকান্তে ধীরে ধীরে রেচন হয়।

গুরু। ইহার নাম 'উজ্জায়ী' কুম্ভক। ইহাদ্বারা কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মাদোষ নষ্ট হয় এবং শরীরের অগ্নি বর্দ্ধিত হয় ; ইহাদ্বারা নাড়ীগত ও ধাতুগত দোষ বিনষ্ট হয় এবং জলোদর অর্থাৎ উদরে জলসঞ্চয়রূপ ব্যাধি দূরীভূত হয়। হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে,—

"মুখং সংযম্য নাড়ীভ্যামাকৃষ্য পবনং শনৈঃ।
যথা লগতি কণ্ঠাত্তু হৃদয়াবধি সস্বনম্॥
পূর্ব্ববৎ কুম্ভয়েৎ প্রাণং রেচয়েচ্চ ততঃপরম্।
শ্লেষ্মদোষহরং কণ্ঠে দেহানলবিবর্দ্ধনম্॥
নাড়ীজলোদরধাতুগতদোষবিনাশনম্॥"

শিষ্য। আবার কখনও বা মুখদ্বারা এবং কখনও বা নাসিকাদ্বারা পূরক হইয়া কুম্ভক হয় ; পরে জালন্ধরবন্ধ হইয়া ধীরে ধীরে নাসাদ্বারা রেচন হইতে থাকে। এই সময় মনটী যেন ভ্রূমধ্যে থাকে এবং বেশ আরাম বোধ হয়।

গুরু। এই কুম্ভকদ্বারা মন সত্বর মূর্চ্ছা (লয়) প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে 'মূর্চ্ছা' কুম্ভক কহে। হঠযোগ-প্রদীপিকায় আছে—

"পূরকান্তে গাঢ়তরং বদ্ধা জালন্ধরং শনৈঃ।
রেচয়েন্মূর্চ্ছনাখ্যেয়ং মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা॥"

শিব-সংহিতায় আছে—

"সুখেন কুম্ভকং কৃত্বা মনশ্চ ভ্রুবোরন্তরম্।
সংত্যজ্য বিষয়ান্ সর্ব্বান্ মনোমূর্চ্ছা সুখপ্রদা॥"

শিষ্য। কোন সময় নাসিকাদ্বারা প্রাণবায়ু বহির্গত (অর্থাৎ রেচক) হইয়া বাহ্য বায়ুতেই কিছুক্ষণ স্থির হইয়া (বহিঃকুম্ভক হইয়া) থাকে এবং পরে পুনরায় পূরক হইতে থাকে।

গুরু। বৎস, ইহাকে 'বাহ্য' কুম্ভক কহে। যোগবাশিষ্ঠে আছে

—"বাহিরে প্রাণবায়ু প্রশমিত হইলে, যাবৎ না অপানবায়ু উদ্গত হয়, তাবৎ যে পূর্ণসমতাবস্থা তাহাই 'বাহ্য'-কুম্ভক।" এই কুম্ভকে প্রাণবায়ু স্থির হইলে শক্তি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া চক্রসমূহ ভেদপূর্ব্বক মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়ায় যোগীর সমাধি উপস্থিত হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! কোন কোন সময় সাধনায় বসিয়া কিছুক্ষণ জপ করিলেই বোধ হয়, যেন প্রাণবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে অথচ রেচক কিম্বা পূরক কিছুই হয় নাই! ইহাতে এমন আরাম বোধ হয় যে, তাহা বর্ণনাতীত ও অতুলনীয়। ইহা কিরূপ কুম্ভক?

গুরু। বৎস, এইরূপ রেচক ও পূরক-বিবর্জ্জিত যে কুম্ভক, তাহাকে 'কেবল' কুম্ভক কহে। যত প্রকার কুম্ভক আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুকৃপায় প্রাণবায়ু সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হইলেই এই 'কেবল' কুম্ভক মুহুর্মুহু হইতে থাকে। যাজ্ঞবল্ক-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে 'কেবল' কুম্ভক সিদ্ধ হইলে ত্রিলোকে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না।

"রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ॥
কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচপূরকবর্জ্জিতে।
ন তস্য দুর্ল্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥"

অভ্যাসদ্বারা 'কেবল' কুম্ভক ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে থাকে এবং প্রাণ-বায়ু ইড়া ও পিঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া সুষুম্নায় চালিত হয়; এই কুম্ভক সিদ্ধ হইলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তি শূন্যতা প্রাপ্ত এবং প্রাণ পরমপদে বিলীন হওয়ায় সমাধি উপস্থিত হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে নানাপ্রকার প্রাণায়ামাদির নাম ও উপকারিতা অবগত হইয়া বড়ই আনন্দলাভ করিলাম। এখন শ্রীচরণে অন্যান্য অনুভব সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বৎস, তোমার যাহা বক্তব্য স্বচ্ছন্দে বল।

শিষ্য। পিতঃ! সাধন করিতে করিতে কখন কখন্ চিন্ চিন শব্দ, কখনও বা দূরাগত ঘণ্টাধ্বনিবৎ শব্দ, এইরূপ আরও নানাপ্রকার শব্দ শ্রুত হয়, ইহা কি?

গুরু। এইরূপ শব্দকেই 'অনাহত নাদ' কহে। ইহা বিনা আঘাতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম 'অনাহত নাদ'। এই অনাহত নাদের অভিব্যক্তি দশবিধ। হংসোপনিষদে আছে—

"চিনিতি প্রথমঃ। চিন্‌চিনিতি দ্বিতীয়ঃ। ঘণ্টানাদস্তৃতীয়ঃ। শঙ্খ-নাদশ্চতুর্থঃ। পঞ্চমস্তন্ত্রীনাদঃ। ষষ্ঠস্তালনাদঃ। সপ্তমো বেণুনাদঃ। অষ্টমো মৃদঙ্গনাদঃ। নবমো ভেরীনাদঃ। দশমো মেঘনাদঃ।"

এই অনাহত নাদই শব্দব্রহ্ম। যোগশিখোপনিষদে আছে,—

"নাস্তি নাদাৎ পরো মন্ত্রঃ।"

অর্থাৎ নাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মন্ত্র নাই।

কেহ কেহ এই নাদের অনুসন্ধান দ্বারাই সমাধিলাভ করেন। একমাত্র এই নাদে মনঃসংযম করিলেই নাদের পরপারে যাওয়া যায়, কারণ—

"মনসো লয়ে দ্বৈতনিবৃত্তিঃ" [হঠযোগ-প্রদীপিকা]

অর্থাৎ মনের লয়েই, অদ্বৈতস্বরূপে স্থিতি হওয়ায়, দ্বৈতনিবৃত্তি হয়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই নাদানুসন্ধান-লয়কেই লয়যোগসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শিষ্য। পিতঃ! জপ করিতে করিতে সময়ে সময়ে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিন্দুবৎ জ্যোতিঃ, জোনাকির ন্যায় আলো, দীপশিখা এবং কোন কোন দিন বিদ্যুৎ, স্ফটিক, ধূম ও নীহার দর্শন হইয়া থাকে। এই সকল কি এবং কেন হয়?

গুরু। বৎস, যেমন বাহ্যাকাশ, হৃদয়ান্তরবর্ত্তী আকাশও তেমনি। সাধনাদ্বারা মন অন্তর্মুখী হইলেই অন্তরাকাশস্থ অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও নীহারাদি অন্তশ্চক্ষুর গোচর হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে—

"যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তস্মিন্ সমাহিতমিতি।"

অর্থ। এই (বাহ্য) আকাশ যদ্রূপ, হৃদয়স্থ অন্তরাকাশও তদ্রূপ। [বহিরাকাশ ও অন্তরাকাশ] এই উভয়ের মধ্যেই দ্যুলোক ও পৃথিবী রহিয়াছে, উভয়ের মধ্যেই অগ্নি ও বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্র এবং উভয়ের মধ্যেই বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রপুঞ্জ রহিয়াছে; ইহাতে (বহিরাকাশে) যাহা কিছু অস্তি ও নাস্তিরূপে অনুভূত হইতেছে তাহাতে (অন্তরাকাশে)ও সেই সমস্তই তদ্রূপে সমাহিত আছে।

বৎস, অন্তরাকাশস্থ এই দৃশ্যগুলি সাধনকালে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই চিহ্নসমূহ প্রত্যক্ষ হইতে থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে মন ক্রমশঃই পরতত্ত্বোপলব্ধির দিকে অগ্রসর হইতেছে। যোগশিখা শ্রুতি বলিতেছেন—

"আত্মমন্ত্রসদাভ্যাসাৎ পরতত্ত্বং প্রকাশতে।
তদভিব্যক্তিচিহ্নানি সিদ্ধিদ্বারাণি মে শৃণু॥
দীপজ্বালেন্দুখদ্যোত-বিদ্যুন্নক্ষত্রভাস্বরাঃ।
দৃশ্যন্তে সূক্ষ্মরূপেণ সদা যুক্তস্য যোগিনঃ॥"

অর্থ। সর্ব্বদা গুরুদত্ত আত্মমন্ত্র অভ্যাস করিতে করিতে পরতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেই মন্ত্রসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ তাহার (পরতত্ত্বের) অভিব্যক্তির চিহ্নসমূহ বলিতেছি, শ্রবণ কর; সদাযুক্ত যোগিগণ

(অন্তর্মুখি-মনঃপ্রবাহহেতু) দীপালোক, চন্দ্র, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, নক্ষত্র ও সূর্য্য, এই সকল দৃশ্য সূক্ষ্মরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে—

"নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥"

অর্থ। যোগসাধনকালে নীহার, ধূম, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্রের ন্যায় রূপসমূহ অন্তরাকাশে গোচরীভূত হইয়া থাকে; এই সকল ব্রহ্মপ্রকাশের চিহ্ন।

বৎস, এই সব অনুভূতি হইতে থাকিলেই আহ্লাদে আটখানা না হইয়া, সর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষ্যে মনঃস্থির রাখিয়া ধীরভাবে সাধন করিয়া যাইবে। "আমি"-বুদ্ধির আশ্রয়ভূত চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই তোমার লক্ষ্য। লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্য্যন্ত ঘড়ির কাঁটার ন্যায় অনবরত চলিতে হইবে। যেমন লোকে মাছ ধরিবার জন্য জলে টোপ ফেলিয়া ফাৎনাটীর প্রতি একাগ্র দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে—আশপাশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগণ ঘাই দিতে থাকিলেও সে তৎপ্রতি মনোযোগ না করিয়া ফাৎনাটীর প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখে—পাছে বা চারে মাছ আসিয়া তাহার অজ্ঞাতসারেই বড়শীর টোপ খাইয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ তুমিও সাধন-কালে যে সকল বিভূতি প্রকাশ পাইবে তৎপ্রতি মনোযোগ না করিয়া অর্থাৎ তদ্দর্শনে আনন্দে অধীর না হইয়া, উদ্দেশ্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদা লক্ষ্যে মনকে স্থির রাখিবে। যোগীর লক্ষ্য—নির্ব্বিকল্প-সমাধি-যোগে অখণ্ডচৈতন্যে মনের লয়।

লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ, এই চারিটী নির্ব্বিকল্প-সমাধি-লাভের অন্তরায়। এই অন্তরায়সমূহ উপস্থিত হইলে, তাহা দূর করিবার জন্য যত্নবান্ হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব! লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ কাহাকে বলে এবং তাহা দূর করিবার উপায় কি, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু। বৎস! বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার উপদেশানুসারে অন্তরায়-নাশের চেষ্টা করিলে শান্তিলাভ করিতে পারিবে।

(১) 'লয়' নামক বিঘ্ন—সমাধি-চিকীর্ষু হইয়া সাধন করিতে থাকিলে মন যদি, অখণ্ড ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্বকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া, নিদ্রিত হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে 'লয়' নামক বিঘ্ন কহে। এইরূপ অবস্থা হইলে, চিত্তকে জড়তা ও অলসতা হইতে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া জপাদি করিবে। এইরূপ কিছুক্ষণ করিলে চিত্তের জড়তা ও অলসতা দূর হইয়া যাইবে।

(২) 'বিক্ষেপ' নামক বিঘ্ন—সমাধি-চিকীর্ষায় বসিলে মন যদি অখণ্ডব্রহ্ম বা আত্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে না পারিয়া অন্য এক তুচ্ছ বস্তু অবলম্বনপূর্ব্বক তাহারই চিন্তা করিতে থাকে, তবে তাহাকে 'বিক্ষেপ'নামক বিঘ্ন কহে। এইরূপ বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে মনকে ঐ তুচ্ছ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া পুনঃ আত্মচিন্তায় রত করিবে। গীতায়ও আছে—

"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥"

অর্থ। স্বভাবগত চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হয় সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া, আত্মা ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বস্তুই মিথ্যা এইরূপ চিন্তাদ্বারা, আত্মাতেই মনকে স্থির করিবে।

(৩) 'কষায়' নামক বিঘ্ন—সমাধি-চিকীর্ষায় বসিলে, লয় ও বিক্ষেপ এতদুভয়ের অভাব হেতু (অর্থাৎ লয় কিম্বা বিক্ষেপও হইল না অথচ), মন রাগাদি বাসনাদ্বারা অভিভূত হইয়া স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইলে, ইহাকে

'কষায়'নামক বিঘ্ন কহে। এই বিঘ্ন উপস্থিত হইলে কিছুক্ষণ সাধনা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া, স্তবস্তুতি পাঠ ও গানাদি করিতে পার। এই সকল কার্য্যদ্বারা মন শান্তভাব অবলম্বন করিলে পুনঃ ধ্যানাদিতে রত হইবে।

(৪) "রসাস্বাদন''নামক বিঘ্ন—সাধনদ্বারা মনের একাগ্রতা জন্মিলে আনন্দ অনুভব হইতে থাকে ; তখন সবিকল্প-আনন্দরস-সম্ভোগে মন চঞ্চল হইতে চাহে। ইহাই 'রসাস্বাদন'নামক বিঘ্ন। এই অবস্থায় প্রজ্ঞা অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ এই আনন্দও নির্ব্বিকল্প-সমাধিজ সুখের তুলনায় তুচ্ছ এইরূপ মনে করিয়া, সেই রসভোগে অনাসক্ত হইবে। গীতায় উক্ত আছে—

"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥''

অর্থ। যেমন নির্ব্বাত-স্থানস্থ দীপ বিচলিত হয় না, তদ্রূপ একাগ্র-চিত্ত যোগীর মন, বিষয়ান্তর-সংসর্গের অভাবহেতু, কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না, সদাই নিশ্চলভাবে আত্মায় অবস্থান করে।

বৎস! এইরূপ আত্মস্থিতিবশতঃ যে পরমানন্দ লাভ হয়, তাহার তুলনায় যোগীর নিকট স্বর্গাদি সুখভোগ, অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্য্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ আত্মসমাহিত অবস্থায় যোগী শীত, উষ্ণ, অস্ত্রাদিদ্বারা আঘাতজনিত দুঃখ ও মশকদংশনাদির উপদ্রব অনুভব করিতে পারে না। গীতায় আছে—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্॥''

অর্থ। যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভকে অধিক বলিয়া

মনে করেন না, যে অবস্থায় স্থিত হইলে গুরুদুঃখদ্বারাও বিচলিত হন না, সেই দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থাকেই **যোগ** বলিয়া জানিবে।

শিষ্য। দয়াময় গুরুদেব! শ্রীচরণে আরও কয়েকটী বিষয় নিবেদন করিবার আছে।

গুরু। আচ্ছা, তোমার যাহা বলিবার আছে তাহা বলিতে পার।

শিষ্য। একদিন সাধন করিতে করিতে দেখিলাম যে সম্মুখে একখানি বৃহৎ আয়না, তাহার মধ্যে যেন আমার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। বাস্তবিক সম্মুখে আয়না আছে কি না এই সংশয় হওয়ায় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি যে সম্মুখে আয়না বা আর কিছু নাই। অন্য একদিন আবার আমার প্রতিবিম্ব দেখিলাম বটে, কিন্তু এবার পূর্ব্বের ন্যায় আয়নার মধ্যে নহে। ইহা কি?

গুরু। বৎস! ইহাকে 'স্বপ্রতীক দর্শন' বলে। এই দর্শনের ফল শিব-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"পুনাতি দর্শনাদত্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা"।

অর্থ। ইহা দর্শনমাত্রই শরীর পবিত্র হয়, এবিষয়ে আর কোন সংশয় করিবে না।

হে পুত্র! তোমরা ভাগ্যবান্, তাই এই সমস্ত অনুভবের জন্য তোমাদিগকে পৃথক্ ভাবে অন্য কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না, কেবল গুরুশক্তিবলে আপনা আপনি এই সব হইতেছে। এই স্বপ্রতীক দর্শন করিবার জন্য যেরূপ সাধনার কথা শিব-সংহিতায় আছে তাহা তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর—

গাঢ় আতপে (সুনির্ম্মল রৌদ্রে) সূর্য্যকিরণ হইতে জাত নিজ স্থূলদেহের ছায়া নিশ্চলচক্ষে দর্শন করিয়া আকাশমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আকাশে স্বপ্রতীক দৃষ্ট হয়। বৎস! কিছুদিন এইরূপ

অভ্যাসের পর স্বপ্রতীকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অতি সুস্পষ্ট দর্শন হইতে থাকে। শিব বলিয়াছেন—যিনি প্রত্যহ এই স্বপ্রতীক দর্শন করেন তাঁহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। তিনি জয়যুক্ত হন এবং বায়ুকে স্ববশে আনিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হন। যিনি সর্ব্বদা এই অভ্যাস করেন তিনি স্বপ্রতীকের অনুগ্রহে পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারেন। পরে নিজ অন্তরেই স্বপ্রতীক দর্শন হয়; ইহা নিশ্চয় জানিও।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার শ্রীমুখবিনিসৃত এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেছি এবং যতই গুরুশক্তির কথা স্মরণ করিতেছি ততই আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেছি। সদ্‌গুরু-কৃপাবলে কি না হইতে পারে? বরাহোপনিষদে পড়িয়াছি—

"দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা॥"

অর্থ। সদ্‌গুরুর কৃপা ভিন্ন বিষয়ত্যাগ, তত্ত্বদর্শন ও সহজাবস্থা এই তিনটীই দুর্লভ।

গুরু। বৎস! ইহা অতি ধ্রুব সত্য; সদ্‌গুরুর কৃপা না হইলে বিষয়াসক্তিত্যাগ অখণ্ড আত্মবস্তুর সাক্ষাৎকার এবং সহজাবস্থা অর্থাৎ জীবন্মুক্তি প্রাপ্তি হয় না। সদ্‌গুরুকৃপায় যাঁহার চিৎশক্তিস্বরূপিনী কুণ্ডলিনীশক্তির জাগরণ ও তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইয়াছে এবং সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে এমন যে যোগী তাঁহার আপনা হইতেই এই অত্যুত্তম সুখস্বরূপ সহজাবস্থা লাভ হয়। * এইরূপ সহজাবস্থাপ্রাপ্ত যোগীর সুখদুঃখাদি বোধ নাই। তিনি সদাই পরমানন্দস্বরূপে মগ্ন। তিনিই কৈবল্যাশ্রমী।

---

* 'উৎপন্নশক্তিবোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ।
যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রকাশতে॥"

"প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি।
তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥"

অর্থ। যেমন প্রাণ দেহ হইতে বাহির হইয়া গেলে দেহে আর সুখদুঃখের বোধ থাকে না, সেইরূপ দেহে প্রাণ থাকা সত্ত্বেও যাঁহার সুখদুঃখবোধ নাই তিনিই কৈবল্যাশ্রমে বাস করেন।

শিষ্য। পিতঃ! সাধনার সময় যদি কোন মন্ত্র লাভ হয় তবে কি তাহাও জপ করিতে হইবে? না, আপনার দত্ত মন্ত্রই জপ করিয়া যাইব? আপনি দয়া করিয়া আমাকে একটা ঠিক করিয়া বলিয়া দিন। যাহা বলিবেন সেই মতেই কার্য্য করিব।

গুরু। বৎস! সাধনার সময় কি ভাবে মন্ত্র পাইলে বল, পরে তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিব।

শিষ্য। (১) পিতঃ! আমি একদিন শেষরাত্রে (অনুমান রাত্রি ৪টার সময়) সাধনা করিতেছিলাম। * সাধনা করিতে করিতে আমার যোগনিদ্রা উপস্থিত হয়; এই যোগনিদ্রিতাবস্থায় দেখি যে আমার সম্মুখে একজন উলঙ্গ পরমহংস সাধু। তাঁহার অতি প্রফুল্ল মূর্ত্তি, অধরে মৃদু মধুর হাসি এবং মুণ্ডিত মস্তক; আমার প্রতি চাহিয়া আছেন ও হাসিতেছেন। আহা! তাঁহার সেই করুণদৃষ্টির কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার মনপ্রাণ যেন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে। তিনি হাসিতে হাসিতে আমার নিকট আসিয়া আমার মস্তকে হস্তপ্রদানপূর্ব্বক একটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং কিছুক্ষণ মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়াই রাখেন। অহো! গুরুদেব, তখন যে কিরূপ আনন্দ হইতে লাগিল তাহা বুঝাইবার মত আমার ভাষা নাই। সেসময় বোধ হইতে লাগিল

* এই সময় সাধনাদি করিলে মুক্তপুরুষদের কখন কখন দর্শন হইয়া থাকে।

যেন আমার শরীর হইতে একটী শক্তি ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে উঠিতেছে এবং পরে তাহা সহস্রারকে ভেদ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাকার জ্যোতিঃরূপে উর্দ্ধে, অতি উর্দ্ধে, চন্দ্রসূর্য্যেরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল (তখন সেই জ্যোতিতে ও আমাতে যেন একত্ববোধ হইতেছিল অর্থাৎ সেই জ্যোতিটীই যেন আমি এইরূপ বোধ হইতেছিল—এই স্থূলশরীরের বোধ তখন ছিল না) এবং তৎপরে এমন একটী স্থানে গেল যেখানে না আছে জ্যোতিঃ না আছে অন্ধকার ; তখন বোধ হইতে লাগিল যেন আর একটু পরে আমার এই আমিত্বটুকুও থাকিবে না। সে সময় ভয় হইল যে যদি আমার এই আমিত্বটুকুও না থাকে তবে থাকিব কি করিয়া ! বোধ হয় এই আমার শেষ নির্ব্বাণ। ইহা মনে করিয়াই ভয়ে কম্পিত হইয়া জাগরিত হইলাম। সেসময় প্রায় ভোর হয়, তাই উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিতে গেলাম। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এমন একটী ভাব জন্মিয়াছিল যে, আমি যেন এই স্থূলদেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এই ভাব দিবা ১০টা কি ১১টা পর্য্যন্ত ছিল, খাওয়া-দাওয়ার পর তবে প্রকৃতিস্থ হই অর্থাৎ পুনঃ দেহাত্মবোধ আসে।

(২) পিতঃ ! আর একদিন আমি গরমের সময় দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর শবাসনে শুইয়া আছি এবং জপ করিতেছি ; জপ করিতে করিতে তন্দ্রার ঘোরে দেখিতেছি পক্ককেশ ও পক্কশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৌরবর্ণ আজানুলম্বিতভুজ এবং দীর্ঘকায় একজন মহাপুরুষ আমার সম্মুখে। তিনি আমাকে কিছু না বলিয়াই আমার দক্ষিণ কর্ণে একটী একটী করিয়া বীজমন্ত্র বলিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কানে ফুৎকার দিতেছেন। তখন আমার শরীরে অত্যন্ত আনন্দবোধ হইতে লাগিল এবং মনে হইতে লাগিল যে আমাতে আরও শক্তি প্রয়োগ করিলে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া কিছু বাহির হইয়া যাইবে, তাই সহ্য করিতে না

পারিয়া মাথা জোর করিয়া টানিয়া আনিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিলাম। *

গুরু। 'বৎস! তোমার এই দুইটী অনুভবের বিষয় শুনিয়া সুখী হইলাম। তুমি অত্যন্ত গুরুভক্ত; তাই জগদ্‌গুরু সাধুরূপে আসিয়া তোমাকে অহৈতুকী কৃপা করিলেন। বৎস! মনে রাখিও সাধু, গুরু ও ঈশ্বর এই তিনই এক। এই প্রাপ্তমন্ত্রাদি কাহাকেও বলিও না; ইহা স্মরণ থাকিলেই হইল, কিন্তু নিরন্তর শক্তিপুটিত গুরুদত্ত মন্ত্রই শ্বাসে প্রশ্বাসে জপাদি করিবে। ইহাই তোমার সাধনার বিষয়; ইহার কৃপাতেই ত এই সব অনুভব হইতেছে। এইরূপ মহাপুরুষ-প্রদত্ত মন্ত্রাদি ইচ্ছা হইলে প্রত্যহ ১০৮ বার জপ করিতে পার, ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

বৎস! তুমি যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র জ্যোতিঃ শরীর হইতে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে দেখিয়াছ তাহাই অন্তরাত্মা। কঠ-শ্রুতিতে আছে—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥"

অর্থ। অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত অন্তরাত্মা পুরুষ সর্ব্বদা (জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই) প্রাণিগণের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যেমন মুঞ্জতৃণ হইতে তন্মধ্যস্থ কোমল তৃণটা বাহির করা যায় তদ্রূপ ধৈর্য্য সহকারে নিজ শরীর হইতে সেই পুরুষকে (গুরূপদেশানুসারে) পৃথক্

* এই মহাপুরুষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

করিয়া লইবে এবং তাঁহাকেই শুদ্ধ (শোক ও মোহাদি দোষবর্জ্জিত) ও অমৃত (নিত্য) বলিয়া জানিবে।

পুনশ্চ—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ।
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ
এতদ্বৈ তৎ॥" [কঠ-শ্রুতিঃ]

অর্থ। সেই অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষ ধূম-রহিত জ্যোতির ন্যায়। তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালেরই ঈশ্বর। তিনি অদ্যও বিদ্যমান আছেন এবং কল্যও থাকিবেন। ইহাকেই পরমাত্মা বলিয়া জানিবে।

হে বৎস! যেমন গবাক্ষ-ছিদ্রদ্বারা সূর্য্যালোক গৃহের দেওয়ালে পতিত হইলে সেই আলোকটা তচ্ছিদ্রের আকারেই দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত হৃদয়রূপ উপাধিদ্বারা উপহিত চৈতন্যকে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত পুরুষরূপে অনুভব করা যায়।

শিষ্য। গুরুদেব! একদিন অতি প্রত্যুষে (ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে) বসিয়া ধ্যান করিতেছি; ধ্যান করিতে করিতে অনুভব করিলাম যে প্রভাত-কালীন সূর্য্যের ন্যায় রশ্মিজালসমাকুল সূর্য্যমণ্ডলাকার যেন আমি। আমার এই স্থূলদেহ যে আছে এরূপ বোধ তখন মোটেই ছিল না, অর্থাৎ স্থূলশরীরে যেমন আমরা আমিত্ব বোধ করি তদ্রূপ সেই মণ্ডলেই যেন আমার আমিত্ব বোধ ছিল। যখন আমার মন বহির্মুখী হইল তখন মনে স্বভাবতঃই একটা জ্ঞান আসিল যে আমি যেন পরমাত্মরূপী সূর্য্য এবং জীব যেন পরমাত্মরূপী সূর্য্যের রশ্মি। যেমন সূর্য্য ও তদ্-রশ্মিতে বাস্তবিক ভেদ নাই, তদ্রূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মাতেও ভেদ নাই, জীবরূপি-রশ্মিসমষ্টিই যেন পরমাত্মরূপী সূর্য্য।

গুরু। বৎস! তোমার এই অনুভূতিটী বড় উত্তম। এই ভাবটী সদা স্মরণ রাখিবে। বাস্তবিক জীবরূপীও তিনি; তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই—অর্থাৎ কেবল তিনিই (পরমাত্মাই) আছেন। তোমার 'আমি'ই যে তিনি; অথবা তোমার উপাস্য তিনিই যে তোমার 'আমি'। এই বস্তুটীকে লাভ করিবার পথ ভিন্ন ভিন্ন থাকিলেও বস্তুটী বাস্তবিক এক। যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধিযোগে ও জ্ঞানী নেতি নেতি বিচারে 'আমিকেই' পরমাত্মা ও ব্রহ্মরূপে এবং ভক্ত ভক্তিযোগে তাঁহাকেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্ রূপে উপলব্ধি করেন। ভেদ কেবল বাক্যে, বস্তুতে কোন ভেদ নাই।

দশম বিবৃতি

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার কথামৃত পান করিয়া পিপাসা মিটিতেছে না, কেবল পান করিতেই ইচ্ছা হইতেছে। তাই অগু প্রার্থনা করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া 'দেহতত্ত্ব-বিষয়ে' কিছু উপদেশ করুন।

গুরু। বৎস! তুমি ভাল বিষয় জানিতে চাহিয়াছ। আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে যোগ-সাধকের পক্ষে, দেহের তত্ত্ব, প্রাণাদির শক্তি ও ক্রিয়া এবং প্রাণ-প্রবাহিনী নাড়ী ও চক্রাদির বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক। আমি তোমাকে এই সকল বিষয়ে উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যেখানে না বুঝিবে, বা কিছু জানিবার ইচ্ছা হইবে, সেখানেই জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানিয়া লইবে।

বৎস! 'দেহ' বলিতে আমরা সাধারণতঃ এই স্থূল দেহটাকে মনে করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল ইহাই দেহ নহে; তাহা পরে বুঝান যাইবে। অগ্রে 'দেহ'শব্দের ব্যুৎপত্তি কি দেখা যাউক। জগদ্-গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য 'দহ' ধাতু হইতে 'দেহ'শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া, দগ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে 'দেহ' বলা যায়, এই অর্থ করিয়াছেন।

"দহ্ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।" [আত্মানাত্মবিবেকঃ]

মৃত্যুর পরে যে দাহ করা হয় তাহাতে ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া 'দেহ'। সাধারণ অজ্ঞান লোকে মনে করিতে পারে যে, মানুষ মরিয়া গেলে তাহাকে পোড়াইয়া ফেলা হইল, সব ফুরাইয়া গেল; কিন্তু

তাহা নহে। তখন যাহা দাহ করা হইল তাহাই 'দেহ'; প্রকৃত বস্তু যে আত্মা, সে ত দেহাতিরিক্ত বস্তু—অক্ষয়—অমর—নিত্যবস্তু—তাহাকে কেহ দগ্ধ করিতে পারে না—"নৈনং দহতি পাবকঃ।" [গীতা]

এতদ্ব্যতীত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপ-জ্বালায় সূক্ষ্মদেহ (মন) সর্ব্বদা দগ্ধ হইতেছে। এইরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম, উভয় দেহই দগ্ধ হয় বলিয়া 'দেহ' নাম হইয়াছে। ইহা শীর্ণ হয় বলিয়া 'শরীর' নাম হইয়াছে,—"শীর্য্যতে ইতি শরীরঃ।"

শিষ্য। পিতঃ! "আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিতাপ" কি? আমাকে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন আত্ম (নিজ)-সম্বন্ধীয় বলিয়া উহাদিগকেও আত্মা বা 'অধ্যাত্ম' বলা হয়; সুতরাং উহাদের জন্য যে দুঃখ তাহাকেই 'আধ্যাত্মিক তাপ' বলে। ইহা দুই প্রকার—শারীর ও মানস। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনের বৈষম্য হইলে যে দুঃখ বা তাপ জন্মে তাহা শারীর দুঃখ, আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষণ্ণতা ও বিষয়-বিশেষের অপ্রাপ্তির জন্য মানস দুঃখ উৎপন্ন হয়।

'ভূত' শব্দে প্রাণিমাত্র ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূতকেই বুঝিতে হইবে; সুতরাং এই ভূত হইতে অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণী এবং ভূমি, জল ইত্যাদি হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাকে 'আধিভৌতিক তাপ' বলে।

যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক প্রভৃতি বিঘ্নকারী দেবযোনি ও শনি প্রভৃতি গ্রহের আবেশ বা দৃষ্টি হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাকে 'আধিদৈবিক তাপ' বলে।

শিষ্য। গুরুদেব! সূক্ষ্ম দেহের অবয়ব কি?

গুরু। বৎস, সূক্ষ্মদেহ সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। সপ্তদশ অবয়ব, যথা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং অন্তঃকরণদ্বয় (মন ও বুদ্ধি)। চিত্তকে মনের অন্তর্গত এবং অহঙ্কারকে বুদ্ধির অন্তর্গত ধরা হইয়াছে বলিয়া চিত্ত ও অহঙ্কারকে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে গণনা করা হয় নাই।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। (১) যাহা চক্ষুগোলক নহে, অথচ চক্ষুর গোলককে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণতারকার সম্মুখবর্ত্তী রূপের গ্রহণ করিতে সমর্থ, সেই রূপগ্রহণে শক্তিমান্ বস্তুই চক্ষুরিন্দ্রিয়; চক্ষুর অধিপতি দেবতা সূর্য্য। (২) যাহা কর্ণরন্ধ্র নহে, অথচ কর্ণরন্ধ্র আশ্রয় করিয়া আকাশস্থ শব্দ গ্রহণ করে; তাহাকে কর্ণ বা শ্রোত্রেন্দ্রিয় কহে; ইহার অধিপতি দেবতা দিক্। (৩) যাহা নাসারন্ধ্র নহে, অথচ নাসারন্ধ্র আশ্রয় করিয়া গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাকে নাসিকা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় কহে; ইহার অধিপতি দেবতা অশ্বিনী-কুমার। (৪) যাহা জিহ্বা নামক মাংসপিণ্ড নহে, অথচ ঐ মাংসপিণ্ড আশ্রয় করিয়া তৎসংলগ্ন বস্তুর রস গ্রহণ করে, তাহাকে জিহ্বা বা রসনেন্দ্রিয় কহে; ইহার অধিপতি দেবতা বরুণ। যাহা ত্বক্ (চর্ম্ম) নহে, অথচ ত্বক্ আশ্রয় করিয়া আপাদমস্তক ব্যাপিয়া শীতোষ্ণাদি স্পর্শানুভব করে তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয় বা স্পর্শেন্দ্রিয় কহে; ইহার অধিপতি দেবতা বায়ু।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। (১) যাহা বাগ্‌যন্ত্র হইতে ভিন্ন, অথচ বাগ্‌যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া, হৃদয়, কণ্ঠ, শির, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, অধঃ ওষ্ঠ, তালুদ্বয় ও জিহ্বা এই অষ্টস্থানবর্ত্তি-শব্দোচ্চারণে শক্তিমান্, তাহাকে বাগিন্দ্রিয় বলে; ইহার অধিপতি দেবতা অগ্নি। (২) যাহা হস্ত হইতে ভিন্ন, অথচ হস্ততলকে আশ্রয় করিয়া দান ও

আদানে (গ্রহণে) সমর্থ তাহাকে পাণীন্দ্রিয় কহে ; ইহার অধিপতি দেবতা ইন্দ্র। (৩) যাহা পাদ নহে, অথচ পাদকে আশ্রয় করিয়া গমনাগমনে শক্তিমান্, তাহাকে পাদেন্দ্রিয় কহে ; ইহার অধিপতি দেবতা উপেন্দ্র। (৪) যাহা পায়ু-গহ্বর হইতে ভিন্ন অথচ পায়ু-গহ্বরকে আশ্রয় করিয়া পুরীষ (মল) পরিত্যাগে শক্তিমান্, তাহাকে পায়ু বা গুহ্যেন্দ্রিয় কহে ; ইহার অধিপতি দেবতা যম। (৫) যাহা উপস্থ-নাল হইতে ভিন্ন, অথচ উপস্থ-নালকে আশ্রয় করিয়া মূত্র ও শুক্রত্যাগে শক্তিমান্, তাহাকে উপস্থেন্দ্রিয় কহে ; ইঁহার অধিপতি দেবতা প্রজাপতি।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচ বায়ু। প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহ্যদেশে, সমান নাভিতে ও উদান কণ্ঠদেশে থাকিয়া এবং ব্যান শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া কার্য্য করে। প্রাণ বহির্গমনশীল, অপান অধোগমনশীল, উদান ঊর্দ্ধগমনশীল, সমান ভুক্ত অন্নাদির সমীকরণশীল (ইহা ভুক্ত অন্নাদিকে পরিপাক করিয়া একজাতীয় করে), আর ব্যান সর্ব্বশরীরে গমনশীল (ইহা সমানবায়ুকর্ত্তৃক সমীকৃত অন্নাদি রসকে সর্ব্বশরীরে বিতরণ করে)। এই প্রধান পাঁচ বায়ুর অন্তর্গত নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচটী উপবায়ু আছে। নাগ বায়ু উদ্গীরণকর (উদ্গার অর্থাৎ ঢেকুরতোলা নাগ বায়ুর কার্য্য), কূর্ম্ম বায়ু উন্মীলনকর (উন্মেষ বা বিকাশ কূর্ম্ম বায়ুর কার্য্য), কৃকর বায়ু ক্ষুৎকর (ক্ষুৎ বা হাঁচি কৃকর বায়ুর কার্য্য), দেবদত্ত বায়ু জৃম্ভনকর (জৃম্ভন করা অর্থাৎ হাইতোলা দেবদত্ত বায়ুর কার্য্য), ধনঞ্জয় বায়ু পোষণকর (দেহের পোষণ করা ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য্য)।

অন্তঃকরণদ্বয়—মন ও বুদ্ধি। মন সংকল্প-বিকল্পাত্মক এবং বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক (অর্থাৎ সংকল্প ও বিকল্প করা মনের কার্য্য এবং নিশ্চয় করা বুদ্ধির কার্য্য)। কেহ কেহ চিত্ত ও অহঙ্কারকে স্বতন্ত্র গণনা

করিয়া অন্তঃকরণচতুষ্টয় বলেন। চিত্ত অনুসন্ধানাত্মক ও অহঙ্কার অভিমানাত্মক (অনুসন্ধান করা চিত্তের কার্য্য এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমান অহঙ্কারের কার্য্য)। মনের অধিপতি চন্দ্র ও বুদ্ধির অধিপতি ব্রহ্মা ; চিত্তের অধিপতি অচ্যুত ও অহঙ্কারের অধিপতি শঙ্কর।

বৎস, এই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ ব্যতীত আর একটী শ্রেষ্ঠ দেহ আছে, তাহাকে কারণ দেহ কহে।

শিষ্য। গুরুদেব! স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের বিভিন্নতা আমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। বৎস, বুঝাইয়া দিতেছি, সাবধান চিত্তে শ্রবণ কর।

এই ত্রিবিধ দেহ পঞ্চকোষে বিভক্ত ; অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। এই স্থূল দেহটীই অন্নময় কোষ, কারণ-দেহটী আনন্দময় কোষ, আর সূক্ষ্ম দেহটী প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোষে বিভক্ত। (১) এই স্থূল দেহটী অন্নময় কোষ, যেহেতু পিতা ও মাতার ভুক্ত অন্নই শুক্র ও রক্তাকারে পরিণত হয়, এবং পিতার ঐ শুক্র ও মাতার ঐ রক্ত সংযোগেই সন্তানের স্থূল দেহ উৎপন্ন হয় ; অতএব অন্নেরই বিকার বলিয়া এই স্থূল দেহকে 'অন্নময় কোষ' কহে। যেমন তরবারির কোষ বা খাপ তরবারিকে, তুষ তণ্ডুলকে এবং গর্ভ (জরায়ু) তন্মধ্যস্থ ভ্রূণকে আবৃত করিয়া রাখে, তদ্রূপ এই অন্নময় কোষ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই অন্নময় কোষ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখার জন্য অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন, ষড়্‌ভাববিকার-রহিত আত্মাকে ষড়্‌ভাববিকারযুক্ত, * এবং তাপত্রয়-রহিত আত্মাকে তাপত্রয়-যুক্ত বলিয়া

* অস্তি, বৃদ্ধি, জন্ম, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ এই ষড়্‌ভাব বিকার।

বোধ হইতেছে। (২) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ প্রাণ মিলিত হইয়া 'প্রাণময় কোষ' নামে অভিহিত হয়। প্রাণের বিকাররূপী এই কোষ, আত্ম-স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া, বক্তৃতারহিত আত্মাকে বক্তা, দাতৃত্ব-রহিত আত্মাকে দাতা, গতিরহিত আত্মাকে গতিশীল এবং ক্ষুৎপিপাসা-রহিত আত্মাকে ক্ষুৎপিপাসাযুক্ত, ইত্যাদি নানাপ্রকারে নির্ব্বিকার আত্মাকে বিকারযুক্তবৎ প্রতিভাত করে। এই প্রাণময় কোষে ক্রিয়া-শক্তি বর্ত্তমান থাকায় ইহাকে 'কার্য্যরূপ' কহে। (৩) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত হইয়া 'মনোময় কোষ' নামে অভিহিত হয়। মনের বিকাররূপী এই কোষ, আত্মস্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া, সংশয়রহিত আত্মাকে সংশয়যুক্ত, শোকমোহরহিত আত্মাকে শোকমোহাদিযুক্ত এবং দর্শনাদিরহিত আত্মাকে দর্শনাদির কর্ত্তারূপে প্রতিভাত করে। এই মনোময় কোষে ইচ্ছাশক্তি বর্ত্তমান, এইজন্য ইহাকে 'করণরূপ' কহে। (৪) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মিলিত হইয়া 'বিজ্ঞানময় কোষ' নামে কথিত হয়। বিজ্ঞান বা বুদ্ধির বিকাররূপী এই বিজ্ঞানময় কোষ, আত্মস্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া, অকর্ত্তা আত্মাকে কর্ত্তা, অবিজ্ঞাতা আত্মাকে বিজ্ঞাতা, নিশ্চয়রহিত আত্মাকে নিশ্চয়যুক্ত এবং জাত্যভি-মানাদিরহিত আত্মাকে জাত্যভিমানাদিযুক্তবৎ প্রতিভাত করে। এই বিজ্ঞানময় কোষে অভিমান বর্ত্তমান—কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব এবং জাতি, কুল, শীল ইত্যাদিতে অভিমানই এই বিজ্ঞানময় কোষের গুণ, এইজন্য ইহাকে 'অভিমানরূপ' বলা হয়। [এই বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষের সমষ্টিই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত সূক্ষ্ম দেহ]। (৫) প্রিয়, হর্ষ এবং আমোদ-বৃত্তিমৎ অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণকেই 'আনন্দময় কোষ' কহে। আনন্দের বিকাররূপী এই কোষ, আত্ম-স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া, প্রিয়-মোদ-প্রমোদরহিত আত্মাকে প্রিয়-

মোদ-প্রমোদবান্ এবং পরিচ্ছিন্নসুখরহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্নসুখবিশিষ্ট-রূপে প্রতিভাত করে। এই আনন্দময়কোষরূপ অজ্ঞানাবরণই জীবের কারণ-শরীর।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে ত্রিবিধ দেহ, তাহাদের বিভাগ ও উপাদান জানিতে পারিলাম। এখন এই ত্রিবিধ দেহ কি ভাবে উৎপন্ন হইল, তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছে!

গুরু। বৎস, তোমার প্রশ্নটী বেশ সুন্দর হইয়াছে। আমি সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বলিতেছি, তুমি তাহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।

জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-জ্ঞাননাশ্য, অনাদি অনির্ব্বচনীয় যে অজ্ঞান, তাহাই এই স্থূলসূক্ষ্ম-দেহদ্বয়ের হেতু; এইজন্য ইহারই নাম কারণ-শরীর। ইহা হইতেই সৃষ্টি, ইহাই নিখিল কারণের কারণ পরমাত্ম-শক্তি এবং ইহা ত্রিগুণাত্মক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"

অর্থ। সেই ঋষিগণ ধ্যানানুগত হইয়া পরমাত্মার নিজ প্রকৃতিগত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা আচ্ছাদিত, তাঁহার আত্মভূত চিৎশক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যিনি একাই কালাত্মযুক্ত (পূর্ব্বে উল্লিখিত কাল, প্রকৃতি, নিয়তি, আত্মা প্রভৃতি) সকল কারণে অধিষ্ঠান করিয়া বিরাজিত আছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবদ্বাক্য আছে—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"

অর্থ। আমার এই দুরতিক্রমনীয়া দৈবী প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী।

ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব জ্ঞানদ্বারা এই অজ্ঞানরূপা প্রকৃতি নাশপ্রাপ্ত হয়, এইজন্য ইহাকেও 'শরীর' কহে; "শীর্য্যতে ইতি শরীরম্" ইহা

আত্মার শরীর গ্রহণের আদিভূত কারণ এবং ইহা হইতেই ক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের বিকাশ হইয়া থাকে ; এইজন্য ইহাই জীবের কারণ-শরীর। এই অজ্ঞান বা কারণ-শরীর ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে এক ও অনেক। অনেকগুলি এক সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে সমষ্টি কহে, আর এক একটীকেই ব্যষ্টি কহে। যেমন অনেকগুলি বৃক্ষ মিলিত হইয়া বন (বৃক্ষ-সমষ্টি), অনেকগুলি জল মিলিত হইয়া জলাশয় (জল-সমষ্টি), এবং এক একটী বৃক্ষ ও একটু একটু জল যথাক্রমে বৃক্ষ ও জলের ব্যষ্টি ; এই প্রকার নানারূপে প্রতিভাসমান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীবগত যে অজ্ঞান তাহাই ব্যষ্টি, আর সেই সমুদায়ের যে একত্ব তাহাই সমষ্টি। এই সমষ্টি অজ্ঞান বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান। এই বিশুদ্ধ-সত্ত্বপ্রধান সমষ্টি-অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা অব্যক্ত, অন্তর্যামী ও জগৎকারণ ঈশ্বর কহে ; ইনি সকল অজ্ঞানের প্রকাশক। ঈশ্বরের এই সমষ্টি-অজ্ঞান অখিলকারণত্ব হেতু 'কারণ-শরীর', আনন্দপ্রচুরত্ব ও কোষবৎ আচ্ছাদকত্ব নিবন্ধন 'আনন্দময় কোষ' এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম সমষ্টি-প্রপঞ্চের লয়-স্থান বলিয়া ইহাকে 'প্রলয়' (সমষ্টি সুষুপ্তি) বলা হয়। আর ব্যষ্টি অজ্ঞান মলিন-সত্ত্বপ্রধান ; এই ব্যষ্টি-অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য অল্পজ্ঞত্ব ও অনীশ্বরত্ব হেতু 'প্রাজ্ঞ' (জীব) নামে কথিত হন ; ইহা অস্পষ্ট-উপাধি ও অতিশয়-প্রকাশের অভাব হেতু ব্যষ্টি-অজ্ঞানের প্রকাশক ; এই জীবগত ব্যষ্টি-অজ্ঞান অহঙ্কারাদির কারণত্ব নিবন্ধন 'কারণ শরীর', আনন্দপ্রচুরত্ব ও কোষবৎ আচ্ছাদকত্ব বশতঃ 'আনন্দময় কোষ', এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যষ্টি-প্রপঞ্চের লয়স্থান হেতু 'ব্যষ্টি-সুষুপ্তি' নামে অভিহিত হয়। বৎস, এই প্রলয় বা সুষুপ্তি-সময়ে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ চৈতন্যপ্রদীপ্ত অতিসূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তিদ্বারা আনন্দ অনুভব করেন, এইজন্য শ্রুতিতে 'আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ' বলা হইয়াছে। এইজন্য

সুষুপ্তি হইতে জাগরিত ব্যক্তির 'আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম, আর কিছু জানিতেছিলাম না' এইরূপ একটা বোধ জন্মে।

বৎস, আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি নামে, এই অজ্ঞানের দুইটী শক্তি আছে। যেমন ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বিশাল-সূর্য্যমণ্ডল-অবলোকনকারীর নয়ন-পথকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, কিন্তু লোকে ভ্রমবশতঃ সূর্য্যমণ্ডলকেই মেঘে আচ্ছাদন করিয়া আছে বলিয়া মনে করে ও তদ্রূপ বলিয়া থাকে, সেই প্রকার অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মার অবলোকনকারী জীবের বুদ্ধিকে অজ্ঞানে আচ্ছাদিত করাতেই আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন ও সংসারীর মত দেখায়। চিৎসুখাচার্য্য তাঁহার "তত্ত্বপ্রদীপিকা" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং
যথা মন্যতে নিষ্প্রভং চাতিমূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥"

অর্থ। যেমন অতিমূঢ় ব্যক্তি, মেঘদ্বারা দৃষ্টি আবৃত হওয়ায়, মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যকে নিষ্প্রভ মনে করে, তদ্রূপ মূঢ়দৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তি, সেই নিত্য উপলব্ধিস্বরূপ আত্মাই যে আমি, তাহাকে বদ্ধের ন্যায় মনে করে।

যেমন দ্রষ্টার নিজ অজ্ঞানদ্বারা রজ্জুর স্বরূপ আবৃত হওয়ায় রজ্জুতে সর্পবোধ জন্মায়, তদ্রূপ এই আবরণ-শক্তিদ্বারা আত্মার স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় আত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ও মোহবদ্ধ সংসারীর মত দেখায়; এইভাবে স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখাই অজ্ঞানের আবরণ-শক্তির কার্য্য। আর, যেমন রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান তদাবৃত রজ্জুতে সর্পাদি উৎপন্ন করে, তদ্রূপ আত্ম-বিষয়ক অজ্ঞান, তদাবৃত আত্মাতে যে প্রপঞ্চাদি উৎপন্ন করে, তাহাই বিক্ষেপ-শক্তির কার্য্য। এই শক্তি-

দ্বয়যুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য নিজ প্রাধান্যদ্বারা 'নিমিত্ত কারণ' এবং নিজ উপাধি অজ্ঞানের প্রাধান্যদ্বারা 'উপাদান কারণ' হন; যেমন লূতা, তন্তুকার্য্য প্রতি, নিজ প্রাধান্যদ্বারা নিমিত্ত কারণ এবং নিজ শরীর প্রাধান্যদ্বারা উপাদান কারণ হয়। শ্রুতিতে আছে—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা স্বতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"

অর্থ। যেমন মাকড়সা নিজেই শরীরস্থ ঊর্ণাদ্বারা জাল নির্ম্মাণ করে এবং আবার নিজ শরীরেই তাহা গ্রহণ করে (গুটাইয়া লয়), যেমন পৃথিবীতে আপনা আপনিই ওষধিসমূহ উৎপন্ন হয়, যেমন এই ব্যক্ত (স্থূল) পুরুষদেহ হইতে কেশ ও লোমসমূহ আপনা আপনিই উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর চৈতন্য হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে [এবং তাঁহাতেই আবার লয়প্রাপ্ত হয়] (এই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ কিম্বা উপাদান-কারণ অন্য কিছুই নাই)।

হে পুত্র! তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের ঈক্ষণ হইতেই আকাশ, আকাশোপহিত চৈতন্যের ঈক্ষণ হইতে বায়ু, বায়ুপহিত চৈতন্যের ঈক্ষণ হইতে তেজঃ, তেজ-উপহিত চৈতন্যের ঈক্ষণ হইতে জল, জলোপহিত চৈতন্যের ঈক্ষণ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই আকাশাদিতে জড়ত্বের আধিক্য দৃষ্ট হওয়ায় তৎকারণকে তমঃ-প্রধান বলা হইয়াছে।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই সূক্ষ্ম পাঁচটী ভূতকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চতন্মাত্র বলা হয়। ইহা হইতেই সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূতাদির উৎপত্তি হইয়াছে। কিরূপে তাহা হইয়াছে, শ্রবণ কর।

সূক্ষ্ম (অপঞ্চীকৃত) পঞ্চ মহাভূতের পৃথক্ পৃথক্ সাত্ত্বিকাংশ হইতে

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) এবং পৃথক্ পৃথক্ রাজসাংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) উৎপন্ন হইয়াছে। (১) আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে কর্ণ (শ্রবণেন্দ্রিয়) ও তাহার রাজসাংশ হইতে বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) উৎপন্ন হইয়াছে। বাক্ ও শ্রবণ আকাশেরই বিকার; কারণ, শব্দ আকাশেরই গুণ (আকাশেই শব্দের উৎপত্তি হয়) এবং জীবদেহে শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা তাহার অনুভব হয় আর বাগিন্দ্রিয় শব্দপ্রকাশের সাধন হয়। (২) বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্ (স্পর্শেন্দ্রিয়) ও তাহার রাজসাংশ হইতে পাণি (পাণীন্দ্রিয়) উৎপন্ন হইয়াছে। ত্বক্ ও পাণি (হস্ত) বায়ুরই বিকার; কারণ, স্পর্শ বায়ুরই গুণ এবং জীবের দেহে ত্বক্দ্বারাই স্পর্শের অনুভব হয়, আর হস্ত স্পৃষ্ট-বস্তু-গ্রহণের সাধন হয়। (৩) তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু (দর্শনেন্দ্রিয়) এবং তাহার রাজসাংশ হইতে পাদ (পাদেন্দ্রিয়) উৎপন্ন হইয়াছে। চক্ষু ও পাদ তেজেরই বিকার, কারণ তেজের গুণ রূপ এবং জীবের দেহে চক্ষুদ্বারা সেই রূপের অনুভব হয়, আর দেহস্থ রাজস তেজ হইতেই গতিশক্তির প্রকাশ ও পাদই তাহার প্রধান সাধন। (৪) জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়) এবং তাহারই রাজসাংশ হইতে উপস্থ (উপস্থেন্দ্রিয়) উৎপন্ন হইয়াছে। জিহ্বা ও উপস্থ জলেরই বিকার, কারণ জলের গুণ রস এবং জীবদেহে জিহ্বাদ্বারা সেই রসের (স্বাদের) অনুভব হয়, আর উপস্থই রস বা আনন্দ উৎপাদনের সর্ব্বপ্রধান সাধন। (৫) পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে নাসিকা (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) এবং তাহার রাজসাংশ হইতে পায়ু (পায়িন্দ্রিয়) উৎপন্ন হইয়াছে। নাসিকা ও পায়ু পৃথ্বীরই বিকার, কারণ পৃথ্বীর গুণ গন্ধ, এবং জীবদেহে নাসিকাদ্বারাই গন্ধের অনুভব হয়, আর পায়ুই দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগের প্রধান সাধন।

এই অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের সম্মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে। অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চারি প্রকার—মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম বুদ্ধি, অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম চিত্ত এবং অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তির নাম অহঙ্কার। বৎস, চিত্ত ও অহঙ্কার যে মন ও বুদ্ধিরই অন্তর্গত তাহা তোমাকে পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে।

অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের সম্মিলিত রাজসাংশ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণ বৃত্তিভেদে পাঁচ প্রকার—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ইহাদের কার্য্যাদির কথা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বৎস! বৃক্ষ ও বনবৎ, জল ও জলাশয়বৎ, এই সূক্ষ্মদেহও, ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে, দুই প্রকার। এই সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহকে কেহ কেহ 'মহৎ তত্ত্ব'ও বলিয়া থাকেন। 'মহৎ তত্ত্ব' বা সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহোপহিত যে চৈতন্য, তিনিই 'সূত্রাত্মা', 'হিরণ্যগর্ভ' ও 'প্রাণ' নামে অভিহিত হন। সূত্রের ন্যায় প্রত্যেকে অনুস্যূত বলিয়া সূত্রাত্মা এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তিযুক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতাভিমানী বলিয়া হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ নামে অভিহিত হন। এই সমষ্টিশরীর বা হিরণ্যগর্ভ স্থূলপ্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া 'সূক্ষ্মশরীর' নামে কথিত হয়। সমষ্টি-চৈতন্যস্বরূপ আত্মার এই শরীরে অভিমানই তাঁহার স্বপ্নাবস্থা। এই অবস্থায় (বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয়ে) অবস্থানকালেও সেই আত্মা জাগ্রদবস্থার ন্যায় সংস্কার ও বাসনাদিদ্বারা যুক্ত হন বলিয়া, এই সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরকে স্থূলপ্রপঞ্চের লয়স্থানও বলা হয়।

ব্যষ্টি-সূক্ষ্মদেহোপহিত চৈতন্য, তেজোময় অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া, 'তৈজস' নামে অভিহিত হন। এই দেহ ব্যষ্টিস্থূলদেহ অপেক্ষা

সূক্ষ্ম বলিয়া, 'সূক্ষ্মশরীর' নামে কথিত হয়। ব্যষ্টি চৈতন্যস্বরূপ 'তৈজস' আত্মার এই শরীরে অভিমানই তাঁহার স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় (বিজ্ঞান-ময়াদি কোষত্রয়ে) অবস্থানকালেও, ব্যষ্টি আত্মা (জীব) জাগ্রদবস্থার সংস্কার ও বাসনাদিদ্বারা যুক্ত হন বলিয়া, এই ব্যষ্টি সূক্ষ্মদেহই ব্যষ্টি স্থূলদেহের লয়স্থান। যেমন, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কারণদেহস্থ ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ সুষুপ্তি অবস্থায়, অজ্ঞানবৃত্তিদ্বারা, আনন্দ অনুভব করেন, তদ্রূপ সূক্ষ্মদেহস্থ সূত্রাত্মা ও তৈজসাত্মা স্বপ্নাবস্থায়, মনোবৃত্তিদ্বারা, বাসনাময় শব্দাদি বিষয়সমূহ অনুভব করেন। এইজন্য শাস্ত্রে তৈজসাত্মাকে 'প্রবিবিক্তভুক্' বলা হইয়াছে।

বৎস, এখন সূক্ষ্মদেহের কিভাবে উৎপত্তি হইয়াছে তাহা বুঝিলে ত?

শিষ্য। হাঁ, দেব, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন স্থূল প্রপঞ্চ ও স্থূল শরীর কিভাবে উৎপন্ন হইল, জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হে পুত্র! সমষ্টি-সূক্ষ্মদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ বা পরমেশ্বর স্থূলরূপে প্রকাশিত হইবার অভিপ্রায়ে ঈক্ষণদ্বারা, অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতকে পঞ্চীকৃত করিয়া, পঞ্চ স্থূলভূত এবং তাহা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহার ক্রম শ্রবণ কর। প্রথমতঃ পঞ্চীকরণ কি, শুন।

সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হইল। ইহাতে যে দশ ভাগ হইল তাহাদের প্রাথমিক পঞ্চ ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনরায় সমান চারি ভাগে বিভাগপূর্ব্বক, নিজ নিজ দ্বিতীয় অর্দ্ধভাগ পরিত্যাগ না করিয়া, ঐ চারি ভাগে বিভক্ত অংশগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভূতে যোজনা করা হইল। ইহা নিম্নে তালিকাকারে স্পষ্টরূপে দেখান যাইতেছে।

পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের সমান দুই ভাগ যথা—

আকাশ	॥০	+	॥০	=	১
বায়ু	॥০	+	॥০	=	১
তেজ	॥০	+	॥০	=	১
জল	॥০	+	॥০	=	১
পৃথিবী	॥০	+	॥০	=	১
	৫ অৰ্দ্ধ	+	৫ অৰ্দ্ধ	=	১০ অৰ্দ্ধ=৫ মহাভূত

তাহাদের প্রাথমিক পঞ্চ ভাগের (পঞ্চার্দ্ধের) প্রত্যেক ভাগের সমান চারি ভাগ, যথা—

আকাশ	॥০	=	৵০+৵০+৵০+৵০
বায়ু	॥০	=	৵০+৵০+৵০+৵০
তেজ	॥০	=	৵০+৵০+৵০+৵০
জল	॥০	=	৵০+৵০+৵০+৵০
পৃথিবী	॥০	=	৵০+৵০+৵০+৵০

এখন এই চারি ভাগে বিভক্তগুলি অপর ভূতে যোজনাদ্বারা কিরূপে স্থূল ভূত হইল, তাহা দেখ—

(১) স্থূল আকাশ = সূক্ষ্ম (অপঞ্চীকৃত) আকাশের নিজ ॥০+সূক্ষ্ম বায়ুর ৵০+সূক্ষ্ম তেজের ৵০+সূক্ষ্ম জলের ৵০+সূক্ষ্ম পৃথ্বীর ৵০

(২) স্থূল বায়ু = সূক্ষ্ম বায়ুর নিজ ॥০+সূক্ষ্ম আকাশের ৵০+সূক্ষ্ম তেজের ৵০+সূক্ষ্ম জলের ৵০+সূক্ষ্ম পৃথ্বীর ৵০

(৩) স্থূল তেজ = সূক্ষ্ম তেজের নিজ ॥০+সূক্ষ্ম আকাশের ৵০+সূক্ষ্ম বায়ুর ৵০+সূক্ষ্ম জলের ৵০+সূক্ষ্ম পৃথ্বীর ৵০

(৪) স্থূল জল = সূক্ষ্ম জলের নিজ ॥০ + সূক্ষ্ম আকাশের ৵০ + সূক্ষ্ম বায়ুর ৵০ + সূক্ষ্ম তেজের ৵০ + সূক্ষ্ম পৃথ্বীর ৵০

(৫) স্থূল পৃথিবী = সূক্ষ্ম পৃথিবীর নিজ ॥০ + সূক্ষ্ম আকাশের ৵০ + সূক্ষ্ম বায়ুর ৵০ + সূক্ষ্ম তেজের ৵০ + সূক্ষ্ম জলের ৵০

শিষ্য। গুরুদেব! এই পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতের প্রত্যেকটীতে অপরাপর ভূতসমূহের অংশ থাকা সত্ত্বেও তাহা অনুভব করি না, কিন্তু কেবল একটী ভূতবিশেষেরই অনুভব করি। ইহার কারণ কি?

গুরু। বৎস! এই স্থূল পঞ্চমহাভূতে অন্যান্য ভূতের অংশ থাকিলেও "বৈশেষ্যাত্তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" এই ন্যায়ানুসারে প্রত্যেক ভূতের নিজ নিজ বিশিষ্টতা থাকার জন্য 'স্থূল আকাশ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। এইজন্য অপর ভূতের অংশ থাকিলেও তাহার অনুভব হয় না।

বৎস, এই পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতেই আবার স্থূলসূক্ষ্মাদিরূপে প্রকাশিত, উপর্য্যুপরিভাবে অবস্থিত ভূ (পৃথিবী লোক), ভুবঃ (অন্তরীক্ষ লোক), স্বঃ (স্বর্গলোক) এবং মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য লোক, আর পরস্পর অধোভাবে অবস্থিত অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল লোক এই চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ প্রাণীর স্থূলশরীরসমূহ এবং তাহাদের ভোজ্য অন্নপানাদি উৎপন্ন হইয়াছে। চতুর্ব্বিধ প্রাণীর কথা নিম্নে বলা যাইতেছে—

(১) মাতৃগর্ভস্থ জরায়ু হইতে জাত প্রাণিসমূহকে জরায়ুজ প্রাণী কহে; যেমন মনুষ্য ও পশ্বাদি।

(২) অণ্ড হইতে জাত প্রাণিসমূহকে অণ্ডজ প্রাণী কহে; যেমন পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি।

(৩) স্বেদ (মলা) হইতে জাত প্রাণিসমূহকে স্বেদজ প্রাণী কহে ; যেমন যূকা ও মশক প্রভৃতি।

(৪) ভূগর্ভ হইতে ভূমি উদ্ভেদ করিয়া জাত প্রাণিসমূহকে উদ্ভিজ্জ প্রাণী কহে ; যেমন বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, তৃণ ইত্যাদি।

কারণদেহ ও সূক্ষ্মদেহের ন্যায় স্থূলদেহও ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে দুই প্রকার ; ব্যষ্টি, বৃক্ষ ও জলের ন্যায়, অনেক বুদ্ধির বিষয় ; আর সমষ্টি, বন ও জলাশয়ের ন্যায়, অনেকে এক বুদ্ধির বিষয়। ইহা অন্নরসের বিকার বলিয়া 'অন্নময় কোষ' এবং স্থূলভোগের আয়তন বলিয়া 'স্থূল-শরীর' নামে অভিহিত। সমষ্টি-স্থূল-শরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্বনরে (সমষ্টিনরে অর্থাৎ সকলপ্রাণিদেহ-সমষ্টিরূপ দেহে) অভিমানী বলিয়া 'বৈশ্বানর' এবং নানারূপে বিরাজমান বলিয়া 'বিরাট্' নামে কথিত হন। সমষ্টি চৈতন্য বা আত্মার ইহাই জাগ্রদবস্থা। ব্যষ্টি-স্থূল-দেহোপহিত চৈতন্য (অর্থাৎ স্থূলদেহী জীব) 'বিশ্ব' নামে কথিত হন ; আত্মা সূক্ষ্ম-দেহের অভিমান পরিত্যাগ না করিয়াই স্থূলশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক, বিভিন্ন স্থূলশরীরে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে 'আমিত্ব'বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন, এইজন্যই তাঁহাকে 'বিশ্ব' বলা হয়। এই ব্যষ্টি স্থূলশরীরও 'অন্নময় কোষ' বটে। ব্যষ্টি আত্মার (জীবের) ইহাই জাগ্রদবস্থা। জাগ্রদবস্থায় বৈশ্বানর ও বিশ্ব, ইন্দ্রিয়দ্বারপথে বহির্জগতের স্থূল বিষয় অনুভব করেন বলিয়া, শাস্ত্রে জাগরিত স্থান 'বহিঃপ্রজ্ঞ' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

শিষ্য। গুরুদেব! অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্ম মহাভূতের পঞ্চীকরণদ্বারা এই স্থূল জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ত বুঝিলাম ; কিন্তু পঞ্চীকৃত ভূতের অংশ হইতে এই স্থূলশরীর কেমন করিয়া হইল, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয় ; দয়া করিয়া বলুন।

গুরু। বৎস! এই শরীরে যে কঠিন অংশ তাহাই পৃথিবী, যাহা

দ্রব অংশ তাহাই জল, যাহা উষ্ণস্বভাব তাহাই তেজ, যাহা সঞ্চরণশীল তাহাই বায়ু এবং এই দেহে যে গর্ত্ত বা ছিদ্র আছে তাহাই আকাশ জানিবে। আবার দেহমধ্যে প্রত্যেক ভূত পাঁচ পাঁচ রূপে অবস্থিত— অস্থি, মাংস, স্নায়ু, ত্বক্ (চর্ম্ম) ও রোম এই পাঁচ রূপে পৃথিবী; শুক্র, পিত্ত, ঘর্ম্ম, লালা ও রক্ত এই পাঁচ রূপে জল; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি ও আলস্য এই পাঁচ রূপে তেজ; ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামণ, চলন ও সঙ্কোচ এই পাঁচ রূপে বায়ু; এবং কটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ ও শির এই পাঁচ রূপে আকাশ অবস্থিত। হে পুত্র! এই অস্থি, মাংস প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি রূপাত্মক পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টিই এই স্থূলদেহ। এখন বুঝিলে ত?

শিষ্য। হাঁ, গুরুদেব! বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন প্রাণ-প্রবাহিণী নাড়ী ও ষট্‌চক্রবিষয়ে, কৃপা করিয়া, উপদেশ করুন।

গুরু। বৎস! আমাদের শরীরমধ্যে প্রধানশক্তিই প্রাণ। আর যত কিছু শক্তি, সকলই এই প্রাণের প্রকাশভেদ মাত্র। সুতরাং প্রাণ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির অস্তিত্বই নাই। আমাদের চক্ষুরাদি দশটী ইন্দ্রিয়ও একমাত্র প্রাণেরই বিভিন্ন প্রকাশ বই আর কিছু নহে। যেমন একই ব্রাহ্মণ যখন পাক করেন তখন পাচক, যখন পূজা করেন তখন পূজক, যখন শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র পাঠ করান তখন পুরোহিত, যখন ছাত্রদিগকে পাঠ করান তখন অধ্যাপক, যখন এজলাসে বসিয়া বিচার করেন তখন হাকিম এবং যখন আফিসে কাগজ-পত্র লেখেন তখন কেরাণী বলিয়া কথিত হন, তদ্রূপ এক প্রাণই বৃত্তিভেদে বহু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন নাড়ীতে প্রাণপ্রবাহ হওয়ার জন্য এক প্রাণশক্তিই বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। যেমন, আমাদের চক্ষুতে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী আছে, যখন তাহাতে প্রাণপ্রবাহ হয়, তখন তাহা

দর্শনশক্তিরূপে প্রকাশ পায়; কোন কারণে এই প্রাণপ্রবাহের গতি-রোধ হইয়া গেলে অনেক সময় দেখা যায় যে চক্ষু আছে কিন্তু দর্শন-শক্তি নাই। এইরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়েই জানিবে। এইজন্যই বলিতে হয় যে এক প্রাণই, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়রূপে, জীবের বিভিন্ন বোধ জন্মাইয়া থাকে ও তাহাকে বিভিন্ন কার্য্য করাইয়া থাকে।

আবার যখন এই প্রাণই, যোগবলে বিভিন্ন নাড়ী হইতে আকর্ষিত হইয়া বিশুদ্ধজ্ঞানবহা নাড়ী সুষুম্নায় চালিত হয়, তখন জীবের আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। এই সুষুম্না নাড়ী ভিন্ন যাবতীয় নাড়ীসমূহকে ভোগবহা নাড়ী কহা যায়। সুষুম্নার অভ্যন্তরস্থিত 'ষট্‌চক্র'নামক মণ্ডলসমূহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহদ্বারা পদ্মের ন্যায় গ্রথিত; এইজন্য ইহা-দিগকে 'ষট্‌পদ্ম'ও কহে। প্রাণশক্তির প্রভাবেই এই পদ্মসমূহ বিকশিত বা প্রস্ফুটিত হয়। ইহা অলৌকিক প্রত্যক্ষের গোচর; লৌকিক প্রত্যক্ষের গোচর নহে—যোগসাধনকালে সুষুম্নাকাশে প্রবল প্রাণ-প্রবাহের প্রভাবে এই পদ্মসমূহ বিকশিত হওয়ায়, যোগী যোগনেত্রে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন; কিন্তু উহারা সাধারণ চক্ষুদ্বারা দর্শন-যোগ্য নহে। এইজন্য এই দেহ হইতে প্রাণ চলিয়া গেলে, শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়াও ইহাদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

শরীরমধ্যে প্রাণপ্রবাহিণী নাড়ী অসংখ্য। কেহ কেহ তিন লক্ষ পঞ্চাশৎ নাড়ী এবং কেহ বা বাহাত্তর হাজার নাড়ী আছে বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ নাড়ী প্রধানা; যথা সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, কুহূ, সরস্বতী, পূষা, শূরা বা পয়স্বিনী, বারুণী, অলম্বুষা, বিশ্বোদরী, রাকা বা যশস্বিনী, শঙ্খিনী ও চিত্রা। ইহাদের মধ্যে আবার সুষুম্না, ইড়া ও পিঙ্গলা এই তিনটীই অগ্রগণ্যা এবং যোগীদিগের বিশেষ বিচার্য্যা। আবার এই নাড়ীত্রয়মধ্যে সুষুম্নাই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, যেহেতু আত্মজ্ঞানপ্রদা বলিয়া, ইহাই মোক্ষসাধনার প্রধান অবলম্বন।

মনুষ্যদেহের পৃষ্ঠদেশে যে মেরুদণ্ড দেখা যায়, তাহার মধ্যে এই সুষুম্নানাম্নী নাড়ী বিদ্যমানা। এই নাড়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী, সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী এবং কিঞ্চিৎ বিকশিত ধুস্তূর (ধুতুরা) পুষ্পের ন্যায়। ইহা মূলাধার-পদ্মাভ্যন্তর হইতে সহস্রদল-পদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। সুষুম্নার মধ্যে বজ্রা নাড়ী। বজ্রা নাড়ী মেঢ্রদেশ (শিশ্নদেশ, স্বাধিষ্ঠান পদ্ম) হইতে শির পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দীপাকারে জ্বলিতেছে। বজ্রা নাড়ীর মধ্যে চিত্রিণী নাড়ী; মাকড়সার জালের সূতা যেরূপ সূক্ষ্ম, চিত্রিণী নাড়ীও সেইরূপ সূক্ষ্ম। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যেই ষট্পদ্ম মালার ন্যায় গ্রথিত আছে। এই নাড়ী মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্রের কিঞ্চিদূর্দ্ধে প্রণব পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে। এই নাড়ী প্রণববিলসিতা, অর্থাৎ ইহা আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত প্রণবদ্বারা স্ফূর্ত্তিমতী এবং একমাত্র যোগীরাই যোগবলে এই নাড়ীর তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। এই চিত্রিণী নাড়ীর অভ্যন্তরে শুক্লবর্ণা ব্রহ্মনাড়ী শোভা পাইতেছে। ব্রহ্মনাড়ী মূলাধারপদ্মস্থ স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখবিবর হইতে মস্তকে সহস্রদল-পদ্মস্থিত পরমশিব পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে। এই নাড়ীপথেই সহস্রার হইতে অমৃতক্ষরণ হইতেছে। এই নাড়ী বিদ্যুন্মালার ন্যায় প্রকাশমানা, অতিসূক্ষ্মস্বরূপা, বিশুদ্ধজ্ঞানময়ী ও নিত্যানন্দস্বরূপিণী।

মূলাধারপদ্ম হইতে ইড়া নাড়ী মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্ব দিয়া, এক একটী পদ্মকে বেষ্টন করিয়া, আজ্ঞাচক্রের উপর দিয়া বাম নাসামূল পর্য্যন্ত এবং পিঙ্গলা নাড়ী মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া, ঐরূপে, আজ্ঞাচক্রের উপর দিয়া দক্ষিণ নাসামূল পর্য্যন্ত গিয়াছে। মূলাধারপদ্মে যে স্থান হইতে তিনটী নাড়ী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উঠিয়াছে তাহাকে 'মুক্ত-

ত্রিবেণী তীর্থ', আর ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে যে স্থানে উহারা পুনর্ম্মিলিত হইয়াছে তাহাকে 'যুক্ত-ত্রিবেণী তীর্থ' বলে ; কারণ ইড়া-রূপা গঙ্গা, পিঙ্গলারূপা যমুনা ও সুষুম্নারূপা সরস্বতী নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থান ঐ দুইটী। কেহ কেহ ইড়াকে চন্দ্র ও পিঙ্গলাকে সূর্য্য কহেন ; এই মতে ইড়ায় যখন প্রাণ প্রবাহিত হয় তখন রাত্রি এবং পিঙ্গলায় যখন প্রাণ প্রবাহিত হয় তখন দিবা। পবনবিজয়স্বরোদয়ে আছে—

"দিবা ন পূজয়েল্লিঙ্গং রাত্রৌ চৈব ন পূজয়েৎ।
সর্ব্বদা পূজয়েল্লিঙ্গং দিবারাত্রি-নিরোধতঃ॥"

অর্থ। দিবাতে আত্মপূজা করিবে না, রাত্রিতেও করিবে না। দিবারাত্রি উভয়কে রোধপূর্ব্বক সর্ব্বদা আত্মপূজা (আত্মধ্যান) করিবে।

এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, যখন ইড়া নাড়ীতে প্রাণপ্রবাহ থাকে, তখন দেহব্রহ্মাণ্ডের রাত্রি বলিয়া, তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ; আর যখন পিঙ্গলায় প্রাণপ্রবাহ থাকে, তখন দেহব্রহ্মাণ্ডের দিবা বলিয়া, রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তমোগুণপ্রধানা বলিয়াই রাত্রি নিদ্রার সময় এবং রজোগুণপ্রধানা বলিয়াই দিবা কর্ম্মের সময় ; এইজন্য বহির্জগতের দিবারাত্রির সন্ধিসময় (প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা) ভগবদুপাসনার উৎকৃষ্ট সময়। সেইরূপ ইড়া তমোগুণবিশিষ্টা ও পিঙ্গলা রজোগুণবিশিষ্টা বলিয়া, যাবৎ ইড়া বা পিঙ্গলায় প্রাণপ্রবাহ থাকে, তাবৎ মন রজস্তমোহ-ভিভূত থাকায়, চঞ্চল বা জড়ভাবাপন্ন থাকে, এইজন্য দিবারাত্রিকে নিরোধ করিয়া, অর্থাৎ পিঙ্গলা ও ইড়ানাড়ীস্থিত প্রাণপ্রবাহকে রোধ করিয়া আত্মচিন্তা করিবে। এই দুই নাড়ীর প্রাণপ্রবাহ নিরুদ্ধ হইলেই, প্রাণ সত্ত্বগুণোপেতা ব্রহ্মনাড়ীতে পরিচালিত হইবে ; কাজেই তখন মনও, রজস্তমোগুণ পরিত্যাগ করিয়া, সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া উঠে ; এই কারণে তখন মনের বিশেষ একাগ্রতা জন্মে, তখনই প্রকৃত ধ্যান আরম্ভ হয়।

বৎস ! এখন অন্যান্য নাড়ীসম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ কর। নাভিচক্র হইতে গান্ধারী ও হস্তিজিহ্বা নাম্নী নাড়ীদ্বয় দর্শনসাধন-চক্ষুর্দ্বয়ে, পূষা ও অলম্বুষা শ্রবণসাধন-কর্ণদ্বয়ে এবং শূরা গন্ধগ্রহণার্থ নাসিকাপ্রান্তে (ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত) গমন করিয়াছে ; বিশ্বোদরী-নাম্নী নাড়ী জঠরে গিয়া চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিতেছে ; সরস্বতী-নাম্নী নাড়ী জিহ্বার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, তাই রসবোধ ও বাক্যের প্রকাশ হয় ; রাকা-নাম্নী নাড়ী জল আহরণপূর্ব্বক নাসিকা-মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় করিয়া হাঁচি উৎপাদন করে। শঙ্খিনী নাড়ী কণ্ঠকূপ হইতে উৎপন্না, অধোমুখী ও ঊর্দ্ধগামিনী, ইহা অন্নসার গ্রহণ করিয়া মস্তকে সঞ্চয় করে ; এই অন্নের সারভাগদ্বারাই মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধি হয়। নাভি হইতে তিনটী নাড়ী অধোদিকে গিয়াছে—কুহূনাড়ী পায়ু পর্য্যন্ত গিয়া মলত্যাগ, বারুণী লিঙ্গে যাইয়া মূত্রত্যাগ এবং চিত্রা শুক্র-ত্যাগ সম্পাদন করে।

হে পুত্র ! এখন ষট্‌চক্র বর্ণনা করিতেছি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই চক্রসমূহ প্রাণপ্রবাহের কেন্দ্রস্থান (centre)। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে মনঃসংযম করিলে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লাভ হয়। ষট্‌চক্র ভিন্ন আরও কয়েকটী গুপ্ত চক্র আছে, তাহাও তোমাকে বলিব। সর্ব্বসমেত চক্র নয়টী। ছয়টী চক্র প্রধান বলিয়া ষট্‌চক্র বলা হয়। অন্য চক্রাদির কথা প্রায়ই কেহ বলে না। সর্ব্বচক্রের অতীত পরমব্রহ্মের স্থান ‘সহস্রার’। এইখানেই যোগীর যোগক্রিয়ার শেষ।

(১) মূলাধার চক্র বা পদ্ম।

গুহ্যের দুই অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে এবং উপস্থের দুই অঙ্গুলী নিম্নে মূলাধার নামক চক্র বা পদ্ম অবস্থিত আছে। এই চক্র চতুর্দ্দলবিশিষ্ট এবং

ঈষৎ রক্তবর্ণ। মূলশক্তির অর্থাৎ কুণ্ডলিনীশক্তির আধার এবং সাধন-ভজনের মূল বলিয়া এই চক্রকে মূলাধার কহে। এই চক্রের চারি দলে বং, শং, ষং, সং এই চারিটী বর্ণ আছে; এই চারিটী বর্ণ তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। এই চক্রের মধ্যস্থলে অষ্টশূলশোভিত চতুষ্কোণ পৃথ্বীমণ্ডল আছে; তাহার মধ্যে ধরাবীজ অর্থাৎ পৃথ্বীবীজ লং আছে। উক্ত পৃথ্বীচক্রের অন্তর্গত পৃথ্বীবীজ-প্রতিপাদ্য দেবতা ইন্দ্র চতুর্হস্ত, নানা ভূষণে ভূষিত ও শ্বেত হস্তীর উপর উপবিষ্ট আছেন। এই চক্রের অধিপতি নবীনসূর্য্যবৎ রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ ও চতুর্মুখ স্রষ্টা ব্রহ্মা। তাঁহার চারি হস্ত চতুর্ব্বেদস্বরূপ (সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব) এবং চারি মুখে তাহা প্রকাশিত হয়। এখানে ব্রহ্মার ক্রোড়ে তচ্ছক্তি চতুর্ভুজা রক্ত-নেত্রা এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালিনী 'ডাকিনী' শক্তি আছেন। এই চক্রের কর্ণিকামধ্যে বজ্রনাড়ীর মুখপ্রদেশে যোনিমণ্ডলের ন্যায় কাম-কলারূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আছে; ঐ যন্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল। এই যোনিমণ্ডলের বাম কোণে ইড়া, দক্ষিণ কোণে পিঙ্গলা এবং মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান। এই যোনিমণ্ডল বা ত্রিকোণমণ্ডল ভোগমোক্ষ-রূপ সর্ব্বকামফলপ্রদায়ক কামরূপ-পীঠ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ইহার মধ্যে তেজোময় রক্তবর্ণ 'ক্লীং'বীজরূপ কন্দর্পনামক স্থিরতর বায়ু বিদ্য-মান আছে। তাহার মধ্যে ব্রহ্মনাড়ীমুখে রক্তবর্ণ ও কোটীসূর্য্য-জ্যোতিঃসম দীপ্তিশালী স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন। তাঁহার শরীরে নবীন-তড়িন্মালাসদৃশী অতিসূক্ষ্মা কুণ্ডলিনীশক্তি সর্পের ন্যায় সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে বেষ্টন করিয়া তাঁহার (স্বয়ম্ভুলিঙ্গের) শিরোপরি নিদ্রিতা আছেন। ইহা দেখিতে শঙ্খের আবর্ত্তনের ন্যায়। এই কুণ্ডলিনী পশু, পক্ষী, দানব, দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস ও কুম্ভীর প্রভৃতি সকল প্রাণীর শরীরেই বর্ত্তমান আছেন। যাঁহার প্রকাশে সকল ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশমান সেই

ত্যজ্ঞানপ্রদা, অতিসূক্ষ্মা ও নিত্যানন্দস্বরূপিণী, বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুজ্জ্বলা পরমশ্রেষ্ঠা কলা অর্থাৎ চিচ্ছক্তি কুণ্ডলিনীর অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তাই, সদ্‌গুরুকৃপায় এই কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইলে সাধনাদ্বারা ক্রমশঃই সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা প্রজ্ঞা লাভ হইতে থাকে। এই প্রজ্ঞাদ্বারাই এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান লাভ হয়। তাই এই কুণ্ডলিনীর জাগরণদ্বারা মানবজীবনের পূর্ণত্ব লাভ হয়। তাঁহাকে সচেতন করিবার জন্যই সাধনভজন ও যোগাদি নানা প্রকার অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। মূলাধারাদি পদ্মসমূহ অধোমুখে মুদিত আছে কিন্তু কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেই পদ্মসমূহ ঊর্দ্ধমুখ ও প্রস্ফুটিত হয়। কেহ কেহ বলেন পদ্মসমূহ সর্ব্বতোমুখী। যিনি এই মূলাধার চক্রে বা পদ্মে কুণ্ডলিনীদেবীর ধ্যান করেন তিনি নরশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইতে পারেন। তিনি নিরাময় এবং বিশুদ্ধস্বভাব হইয়া গদ্যপদ্যাদি রচনাদ্বারা দেবতা ও গুরুদেবের স্তুতি করিতে সমর্থ হন। এই মূলাধার চক্র বা পদ্মকে ভূলোক বলে।

(২) স্বাধিষ্ঠান চক্র বা পদ্ম।

মূলাধার চক্র বা পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে লিঙ্গমুখে সুষুম্নার অন্তর্গত চিত্রিণী নাম্নী নাড়ীতে সিন্দূরের ন্যায় লোহিতবর্ণ ষড়্‌দলবিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান চক্র বা পদ্ম বিরাজিত আছে। ঐ পদ্ম তড়িদ্বৎ সমুজ্জ্বল, ছয় দলে বং, ভং, মং, যং, রং, লং এই ছয়টী বর্ণ আছে। এই পদ্মে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শ্বেত-বর্ণ বরুণ (জল)-মণ্ডল ও তন্মধ্যে শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় শ্বেতবর্ণ বরুণ-বীজ 'বং' বিদ্যমান আছে। বরুণবীজ-প্রতিপাদ্য বরুণদেবতার দুই হাত, শ্বেতবর্ণ এবং তিনি মকরারোহণে আছেন। এই পদ্মের অধিপতি দেবতা বিষ্ণু; তাঁহার নীলবর্ণ, চারি হস্ত ও পরিধানে পীতাম্বর।

তিনি নবযৌবনসম্পন্ন, তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎসকৌস্তুভভূষিত। তিনিই সকলের পালনকর্ত্তা। তৎক্রোড়ে নীলবর্ণা দিব্যালঙ্কারভূষিতা চতুর্ভুজা 'রাকিনী'-নাম্নী শক্তি আছেন। যিনি এই সাধিষ্ঠান পদ্ম চিন্তা করেন তাঁহার অহঙ্কারাদি রিপুসমূহ নাশপ্রাপ্ত হয়। এই সাধিষ্ঠান পদ্মকে ভুবর্লোক বলে।

(৩) মণিপূর চক্র বা পদ্ম।

সাধিষ্ঠান পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে নাভিমূলে দশদলবিশিষ্ট মণিপূরনামক চক্র বা পদ্ম আছে। এই দশ দলে ডং, ঢং, ণং, তং, থং, দং, ধং, নং, পং, ফং এই দশটী বর্ণ আছে। এই মণিপূর পদ্মের মেঘের ন্যায় বর্ণ; আর ইহার দশটী বর্ণ (অক্ষর) নীলবর্ণ। এই পদ্মে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল শোভমান আছে; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ 'রং' বিদ্যমান আছে। বহ্নিবীজ-প্রতিপাদ্য অগ্নিদেবতার চারি হস্ত, রক্তবর্ণ এবং তিনি মেষারোহণে আছেন। এই পদ্মের অধিপতি রুদ্র। তাঁহার বিশুদ্ধ সিন্দুরের ন্যায় বর্ণ, ভস্মভূষিত দেহ ও ত্রিনেত্র এবং তিনি বৃদ্ধ ও সৃষ্টিসংহারকারী। তাঁহার দুই হস্ত—এক হস্তে বর এবং অন্য হস্তে অভয়। তাঁহার অঙ্কদেশে তচ্ছক্তি চতুর্ভুজা শ্যামবর্ণা পীতাম্বরা ও নানালঙ্কারভূষিতা 'লাকিনী'-নাম্নী শক্তি আছেন। যিনি এই মণিপূর পদ্ম ধ্যান করেন তিনি সৃজন পালন ও নিধনে সক্ষম হন; তাঁহার মুখপদ্মে বাগ্দেবী সতত প্রকাশিতা হন। পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে—

"নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্।"

অর্থ। নাভিচক্রে মনঃসংযম করিলে দেহতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান জন্মে।

এই পদ্মে ব্রহ্মগ্রন্থি বর্ত্তমান আছে। এই গ্রন্থি ভেদ হইবার সময় সাধকের শরীর কৃশ হইয়া যায় এবং উদরাময় হয়। উদরাময় হইলে

ষট্‌চক্র
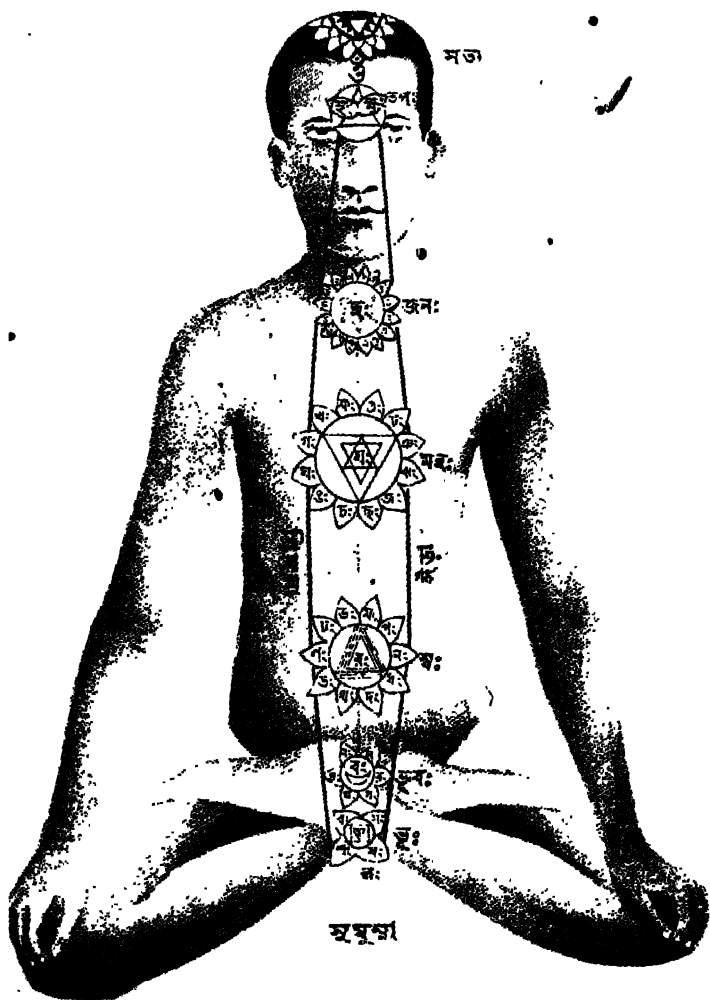
ঔষধ না খাইয়া বরং এই পদ্মেরই ধ্যান করা কর্ত্তব্য ; তাহাতেই ব্যাধি আরোগ্য হইবে। এই মণিপূরনামক পদ্মে মন রাখিয়া জপাদি করিলে মন্ত্রের কম্পন সত্বরই অনুভব হয় এবং ক্রমশঃ মনও শান্ত হইয়া আসিতে থাকে। এইখানে মন রাখিয়া জপাদি করিলে অগ্নিবলও বৃদ্ধি হয়, অজীর্ণতাদি দূর হয় ও শরীর রসশূন্য হইতে থাকে। শরীর রসশূন্য হওয়ার জন্য অল্প মূত্র ও অল্প পুরীষ হইতে থাকে। যাঁহারা কেবল 'লয়যোগ' অভ্যাস করেন তাঁহারা এই স্থানেই ধ্যানাদি করিতে থাকেন। এইখানে মনঃসংযম হইলে নাদও শ্রুতিগোচর হয়। এই মণিপূর পদ্মকে স্বর্লোক (স্বর্গ) বলে।

(৪) অনাহত চক্র বা পদ্ম।

মণিপূরনামক চক্র বা পদ্মের উর্দ্ধদেশে হৃদয়ে দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহতনামক চক্র বা পদ্ম আছে। এই পদ্মের বর্ণ বন্ধুকপুষ্পসদৃশ সমুজ্জ্বল। এই দ্বাদশদলে কং, খং, গং, ঘং, ঙং, চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং, এই বারটী বর্ণ আছে, ইহাদের রং সিন্দুর বর্ণ। এই পদ্মমধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণযুক্ত বায়ুমণ্ডল আছে। এই ষট্‌কোণমধ্যে ধূম্রবর্ণ 'যং' এই বায়ুবীজ আছে। তাহার অঙ্কপ্রদেশে বায়ুবীজ-প্রতিপাদ্য বায়ু-দেবতা ; তাঁহার ধূম্রবর্ণ ও চতুর্ভুজ এবং তিনি কৃষ্ণসারে উপবিষ্ট আছেন। এই পদ্মের অধিপতি দেবতা 'ঈশান' বা 'ঈশ্বর'। তিনি ত্রিভুবনবাসী জনগণের অভয়দাতা ও বরদানশীল। তাঁহার শুভ্রবর্ণ ও দুই হস্ত। তাঁহার ক্রোড়দেশে নিজ পত্নী, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণা, ত্রিনেত্রা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, কঙ্কালমালাধারিণী, চতুর্ভুজা ও যোগিজনের কল্যাণকারিণী 'কাকিনী'-নাম্নী শক্তি আছেন ; তাঁহার চারি হস্তে পাশ, কপাল, বর ও অভয় শোভমান আছে। এই পদ্মে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল

'বাণ'নামক শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার মস্তকে তেজোময় অতিস্
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটী মণি আছে। তন্মধ্যে বায়ুহীন-দীপশিখাকার
শ্বেতবর্ণ হংসবীজের প্রতিপাদ্য ও অহঙ্কারের আশ্রয় তেজোবিশেষ আছে।
ইহাকেই জীবাত্মা কহে। তিনি সুখদুঃখ ও কর্ম্মফল ভোগ করেন।
সদ্‌গুরুকৃপায় এই জ্যোতিঃদর্শন করিয়া তাহাতে মনঃসংযম করিলে
শোকমোহাদি থাকে না; এইজন্য এই জ্যোতিঃ 'বিশোক' নামে
খ্যাত।

এই পদ্ম কল্পবৃক্ষবৎ সর্ব্বকামপ্রদ। যেমন কল্পতরুর নিকট যে যাহা
চাহে তাহাই পায় তদ্রূপ সগুণোপাসক পূজার জন্য এখানে যাহা
খুঁজিবে তাহাই পাইবে।

বিনা আঘাতে এখান হইতে স্বতঃই নাদ হইতেছে বলিয়া ইহাকে
'অনাহত' পদ্ম বলা হয়। শব্দব্রহ্মের (ওঁকারের) স্থান এইখানে।

"শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহ সাক্ষাদ্দেবঃ সদাশিবঃ।
অনাহতেষু চক্রেষু স শব্দঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥"

[পরাপরিমলোল্লাসঃ]

অর্থ। যাহাকে শব্দব্রহ্ম বলা হয় তাহাই সাক্ষাৎ সদাশিব; সেই
শব্দ অনাহত চক্রে আছে।

এই পদ্মে বিষ্ণুগ্রন্থি বর্ত্তমান। এই পদ্ম-ভেদকালেও কষ্ট হয়।
এই অনাহতনামক পদ্মকে মহর্ল্লোক বলে। ইহাকে 'পূর্ণগিরি'নামক
পীঠও বলা হয়। এই পদ্ম ধ্যান করিলে বাক্‌পতিত্ব লাভ হয় এবং
সেই সাধক জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হন। তিনি
যোগিশ্রেষ্ঠ হইতে পারেন ও জিতেন্দ্রিয় হন। তাঁহার অত্যুত্তম কবিত্ব-
শক্তি লাভ হয় এবং পরদেহে প্রবেশ করিবারও শক্তি জন্মে।

(৫) বিশুদ্ধ চক্র বা পদ্ম।

অনাহতনামক চক্র বা পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে কণ্ঠে ষোড়শদলবিশিষ্ট বিশুদ্ধনামক চক্র বা পদ্ম আছে। এই পদ্মের রং ধূম্রবর্ণ। ষোড়শ দলে অং, আং, ইং, ঈং, উং, ঊং, ঋং, ৠং, ঌং, ৡং, এং, ঐং, ওং, ঔং অং, অঃ, এই ষোড়শটী স্বরবর্ণ আছে; ইহাদের রং শোণ ফুলের বর্ণ-সদৃশ। এই পদ্মমধ্যে পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বৃত্তাকার আকাশমণ্ডল আছে। এখানে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে স্ফটিকসদৃশ 'হং'বীজ, ও তৎপ্রতিপাদ্য আকাশ-দেবতা আছেন। তিনি হিমচ্ছায়াসদৃশ শুভ্রগজোপরি আরূঢ়; তাঁহার শুক্লবর্ণ ও চারি হস্ত। চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বর শোভিত আছে। তাঁহার অঙ্কপ্রদেশে এই পদ্মের অধিপতি সদাশিব আছেন। তাঁহার পঞ্চমুখ ও প্রত্যেক মুখে ত্রিনেত্র; তাঁহার দশ হাত এবং পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর। ইহাকে অর্দ্ধনারীশ্বর কহে। তাঁহার ক্রোড়ে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী চতুর্ভুজা 'শাকিনী'-নাম্নী শক্তি আছেন। তাঁহার পরিধানে পীতাম্বর এবং চারি হস্তে শর, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ বিদ্যমান আছে। তিনি সর্ব্বদাই চন্দ্রবিগলিত-সুধাপানে পুলকিত। এই পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল আছে; ইহা পরমপদ-নিরত শুদ্ধমনা সাধকের মোক্ষের দ্বারস্বরূপ। সাধনাদ্বারা এইখানে মনের স্থিতি হইলে মন আকাশের মত বিশুদ্ধ হয়, এইজন্য ইহাকে 'বিশুদ্ধ' পদ্ম বলা হয়। এই পদ্মে মনঃসংযম করিয়া যোগী যদি ক্রোধ করেন তবে ত্রিভুবন বিচলিত হয়। যিনি সদা এই পদ্ম ধ্যান করেন তিনি কবি, বাগ্মী, মহাজ্ঞানী, শান্তচিত্ত, নীরোগ, শোকহীন ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। এই পদ্মকে 'জনলোক' বলে। এই পদ্মে 'জালন্ধর'-নামক পীঠ বর্ত্তমান আছে।

(৬) ললনা চক্র বা পদ্ম।

বিশুদ্ধ চক্র বা পদ্মের ঊর্দ্ধদেশে তালুমূলে ললনা চক্র বা পদ্ম শোভমান আছে। এই পদ্ম রক্তবর্ণ ও দ্বাদশদলবিশিষ্ট, এই চক্র বা পদ্মে অমৃতস্থলী আছে। এই পদ্মের এক এক দলে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দয়া, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, অরতি, সম্ভ্রম, ঊর্ম্মি ও শুদ্ধতা এই বারটী বৃত্তি আছে। এই চক্র ধ্যান করিলে উন্মাদ, জ্বর ও পিত্তাদি রোগ আরোগ্য হয়।

হে পুত্র! যোগস্বরোদয়ে এই পদ্ম বা চক্রের ৬৪ দল বর্ণিত আছে—

"চতুঃষষ্টিদলং তালুমধ্যে চক্রন্তু মধ্যমং।
পীযূষপূর্ণকোটীন্দুসন্নিভং অমৃতস্থলী॥"

অর্থ। তালুমধ্যে চতুঃষষ্টিদলবিশিষ্ট মধ্যম চক্র আছে। এখানে কোটিচন্দ্রসদৃশ অমৃতপূর্ণ অমৃতস্থলী আছে।

(৭) আজ্ঞা চক্র বা পদ্ম।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে আজ্ঞানামক একটী চক্র বা পদ্ম বিদ্যমান আছে। এখানে মনঃসংযম হইলে আজ্ঞা অর্থাৎ দৈববাণী লাভ হয় এইজন্য ইহাকে আজ্ঞা চক্র বা পদ্ম বলা হয়। এই পদ্ম শুভ্রবর্ণ এবং যোগিগণের ধ্যানস্থল। এই পদ্মের দুই দলে হং, ক্ষং, এই দুইটী বর্ণ আছে। এই দুই দলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক দুইটী বৃত্তি আছে। এই পদ্মের অধিপতি দেবতা জ্ঞানদাতা শিব; তাঁহার শ্বেতবর্ণ, দুই হস্ত ও ত্রিনেত্র। এখানে বিদ্যামুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালাধারিণী চতুর্হস্তা ষড়ানন্দা 'হাকিনী'-নাম্নী শক্তি আছেন।

এই পদ্মের কর্ণিকাতে তিন গুণ আছে। এই যোনিরূপিণী

কর্ণিকার তিন কোণে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই কর্ণিকার বর্ণও শুভ্রবর্ণ। ইহার মধ্যে 'ইতর' নামক শিবলিঙ্গ আছেন। এই পদ্ম ইচ্ছাশক্তির স্থান; ইহার অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা।* এখানে মনঃসংযম করিলে প্রগাঢ় ইচ্ছাশক্তি উৎপন্ন হয়। এই ইচ্ছাশক্তিবলে সাধক সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে সমর্থ হন; তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তুল্য হন।

ভিন্ন ভিন্ন পদ্ম ধ্যান করিলে যে সব ফল পাওয়া যায়, একমাত্র এই পদ্মের ধ্যানদ্বারাই তৎসমুদয় ফল লাভ হয়।

এই পদ্মে রুদ্রগ্রন্থি; এই রুদ্রগ্রন্থি-ভেদ হওয়ার সময় সাধকের আহার কমিয়া যায় ও মলমূত্রাদি অল্প হয়। আহার কমিয়া যাওয়ার জন্য শরীর দুর্ব্বল ও কৃশ হয় না, বরং কান্তি বৃদ্ধি হয়। এই পদ্ম ভেদ হইলে কুণ্ডলিনীশক্তি অনায়াসে (বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া) সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিতা হন।

বৎস! এই পদ্ম-ভেদের সময় ভ্রূমধ্য বা কপাল ইত্যাদি স্থান ভয়ানক টন্‌টন্ করিতে থাকে, বোধ হয় যেন কিছু বজ্রের মত লাগিয়া রহিয়াছে, হয় ত উহা ফাটিয়া যাইবে। সেই সময় নানারূপ ক্রিয়া হইতে থাকে।

সাধারণতঃ এই বক্ষঃস্থলকেই লোকে হৃদয় বলিয়া জানেন কিন্তু আজ্ঞাপদ্মকেও যে হৃদয় বলা হয় তাহা অনেকেই জানেন না।

"তদেব হৃদয়ং নাম সর্ব্বশাস্ত্রাদি সম্মতম্।
অন্যথা হৃদি কিঞ্চাস্তি প্রোক্তং যৎ স্থূলবুদ্ধিভিঃ ॥"

[যোগস্বরোদয়ঃ]

অর্থ। উহাই অর্থাৎ এই আজ্ঞাপদ্মই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত হৃদয়। স্থূল-বুদ্ধি ব্যক্তিরাই অন্য স্থলকে (বক্ষঃস্থলকে) হৃদয় বলিয়া থাকেন।

এই আজ্ঞাপদ্মের উপরে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মিলন-স্থান। মূলাধার হইতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রবাহিত হইয়া এই স্থানে মিলিত হইয়াছে। ইড়াকে গঙ্গা, পিঙ্গলাকে যমুনা ও সুষুম্নাকে সরস্বতী বলা হয়। এই স্থানের নাম 'যুক্ত ত্রিবেণী'; ইহার অন্য নাম 'তীর্থরাজ'। এখানে মানস-স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।* এই আজ্ঞাপদ্মকে 'তপোলোক' বলা হয়।

(৮) মনশ্চক্র।

আজ্ঞাপদ্মের কিঞ্চিদূর্দ্ধে মনশ্চক্র; এখানে মনের স্থান। এই মনশ্চক্রে জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ অন্তরাত্মা বিরাজিত আছেন; তিনি দীপ-শিখাকার। এখানে বর্ণরূপী অক্ষর ব্রহ্ম (ওঁ) শোভমান আছেন; ইহা সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহার ঊর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত আছে। তাহার উপরে তেজঃপুঞ্জ একটী বিন্দু এবং ঐ বিন্দুর উপরিভাগে শুভ্রবর্ণ চন্দ্রমা-সম নাদ (শিবলিঙ্গ) আছে। এই মনশ্চক্রের ছয়টী দল; ইহার ছয় দলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও স্বপ্ন এই কয়টী বৃত্তি আছে। দলগুলি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত—কোনটী সাদা, কোনটী লাল এবং কোনটী পীত ইত্যাদি। ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় ঘুরিয়া মন যখন যে দলে যায় তখন তদ্রূপ ভাবের উদয় হয়; যেমন, মন যখন শ্বেত দলে যায় তখন সত্ত্বভাবের, রক্তবর্ণ দলে যাইলে রজোভাবের এবং পীতবর্ণ দলে যাইলে তমোভাবের উদয় হয়।

* ইড়া ভাগীরথী গঙ্গা পিঙ্গলা যমুনা নদী।
তয়োর্ম্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্নাখ্যা সরস্বতী॥
ত্রিবেণী সঙ্গমে যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
[জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রম্]

(৯) সোম চক্র।

এই মনশ্চক্রের কিঞ্চিদূর্দ্ধে সোমচক্র অবস্থিত। এই চক্রের ষোড়শ দল; এই ষোড়শ দল ষোড়শ কলা নামে প্রসিদ্ধ। ষোড়শ কলা যথা—কৃপা, মৃদুতা, ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, ধৃতি, সম্পদ, হাস্য, রোমাঞ্চ, বিনয়, ধ্যান, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য্য, উদ্যম, অক্ষোভ, ঔদার্য্য ও একাগ্রতা। এই সোমচক্রে মনের স্থিতি হইলে ধৈর্য্য, বৈরাগ্য, অক্ষোভ, সুস্থিরতা, গাম্ভীর্য্য ও একাগ্রতা ইত্যাদি দৃঢ় হয়। এই সোমচক্রের কিঞ্চিদূর্দ্ধে নিরালম্বপুরী। কেহ কেহ ইহাকে শূন্যস্থানও বলেন। এখানে মন অবস্থিত হইলে বিনা অবলম্বনেই মন স্থির এবং বিনা রোধেই বায়ু স্থির হয়। এখানে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন জগতের সাক্ষিস্বরূপ পূর্ণৈশ্বর্য্য অব্যয় জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই নিরালম্ব-পুরীতে উড্যানাখ্য মহাপীঠ বর্ত্তমান আছে।

হে পুত্র! এই নিরালম্বপুরীতে মন থাকিলে দেহাত্মবোধ থাকে না; তখন আপনাকে আদ্যন্তরহিত চিৎশূন্য বলিয়া বোধ হয়। এতকাল যে পাঞ্চভৌতিক দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিকে 'আমি ও আমার' বলিয়া আসিতেছিলাম তাহা যেন, এখানে মন আসিলে, ঝটিতি (মুহূর্ত্তমধ্যে) ঘূর্ণিবায়ুর মত কোথায় উড়িয়া যায়। তখন অতিসুন্দর, অতিনির্ম্মল নিত্যানন্দধামে নিত্য আমির (আত্মার) উপলব্ধি। আহা! এই আমিই ত জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সর্ব্বাবস্থায় একরূপ ও সাক্ষিস্বরূপ, আমিই ত সর্ব্ববস্তুতে ওতপ্রোতভাবে আছি, আমি ভিন্ন যে আর দ্বিতীয় সত্বাই নাই, আমাতেই যে সব এবং আমিই যে সকলে ইত্যাদি অনুভব হইতে থাকে। মরুভূমিতে মরীচিকায় প্রতারিত তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের সুশীতল-বৃক্ষচ্ছায়া-প্রাপ্তিবৎ মনটী যেন এখানে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

সহস্রার পদ্ম।

হে পুত্র! এখন সর্ব্বচক্র বা সর্ব্বপদ্মের অতীত, সাধকের চরম উপলব্ধির স্থান ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের নিজ নিজ উপাস্যের স্থান সহস্রার পদ্মের বর্ণনা করিতেছি তাহা শ্রবণ কর। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি এই নবচক্রকে ভেদ করিয়া সহস্রারে পরমশিব বা পরমব্রহ্মের সহিত মিলিত হইলেই সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধি-যোগেই সাধক ব্রহ্মের অদ্বৈতস্বরূপে স্থিতিলাভ করেন। এখানে 'আমি, তুমি ও সে' বলিয়া কিছুই নাই, সবই একাকার; এখানেই 'ব্রহ্মৈব কেবলম্', এখানেই আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তির মূল পরমানন্দ-প্রাপ্তির স্থান।

হে বৎস! শিরোদেশে ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল-বিশিষ্ট একটী পদ্ম আছে; তাহা শ্বেতবর্ণ। এখানে শ্বেতবর্ণ বাগ্‌ভব-বীজ অর্থাৎ গুরু-বীজ 'ঐং' আছে। তৎপার্শ্বেই তৎপ্রতিপাদ্য শ্রীগুরুদেব আছেন। তাঁহার শ্বেতবর্ণ, দুইটী হাত; দুই হাতে বর ও অভয়। তাঁহার গলায় শ্বেত-মাল্য ও পরিধানে শ্বেতবস্ত্র এবং শরীর শ্বেতগন্ধানুলিপ্ত; তাঁহার প্রসন্ন বদন। তাঁহার ক্রোড়দেশে প্রাতঃসূর্য্যবৎ রক্তবর্ণা নিজ শক্তি আছেন। তাঁহার দ্বিভুজ; তিনি বাম হস্তে পদ্ম ধারণ ও দক্ষিণ হস্তদ্বারা শ্রীগুরু-শরীর বেষ্টন করিয়া আছেন। এই পদ্মের কর্ণিকায় ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে। এখানে শূন্যাকার স্থান আছে। এই ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল-কমলোপরি সহস্রদলপদ্ম ছত্রের ন্যায় অধোমুখে বিকসিত রহিয়াছে; ইহা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, শুভ্রবর্ণ ও মনোহর। এই পদ্মের দলগুলি শ্বেতবর্ণ, ইহাতে অকারাদি পঞ্চাশটী বর্ণ আছে। ইহা কেবলানন্দস্বরূপ।

এই পদ্মে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র শোভমান আছেন। তদীয় জ্যোৎস্না-জাল পরম শোভা বিস্তার করিতেছে এবং ঐ চন্দ্রের স্নিগ্ধ সুধারাশি

হাস্তের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ইহার মধ্যে বিদ্যুদাকার ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে। এই তিন কোণে হং, লং, ক্ষং, এই তিনটী বর্ণ আছে। এই ত্রিকোণমণ্ডলের নাম শক্তিমণ্ডল। তন্মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন, কোটি-সূর্য্যস্বরূপ তেজোময় ও কোটিপূর্ণচন্দ্র-সদৃশ সুশীতল একটী বিন্দুস্বরূপ শূন্যস্থল আছে।

এখানে আকাশরূপী পরমাত্মস্বরূপ সকল সুরগণের গুরু পরমশিব অবস্থিত আছেন। তিনি পরমানন্দস্বরূপ এবং সকল জীবগণের অজ্ঞান-নাশের কারণ। এখানে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি পরমশিবের সহিত মিলিত হইলেই সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হয়। এই শূন্যস্থলকেই শিবভক্তগণ শিবস্থান, বৈষ্ণবগণ পরমপুরুষ হরির স্থান, দেবীভক্তগণ শক্তির স্থান এবং কোন কোন মুনিঋষি ইহাকে প্রকৃতিপুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। এই স্থানে প্রভাতকালীন তরুণসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণা শুদ্ধা মৃণাল-তন্তুর শতাংশের একাংশবৎ সূক্ষ্মা অমা-নাম্নী চন্দ্রের পরা ষোড়শী কলা বিদ্যমানা। ইহা বিদ্যুৎসমূহের মত দীপ্তিমতী, সততই প্রকাশশীলা ও অধোমুখী।

হে পুত্র! চন্দ্রের ষোড়শ কলা; কিন্তু এই ষোড়শ কলার মধ্যে অমা-কলা ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় কলারই ক্ষয় ও বৃদ্ধি আছে; এই অমা-কলার ক্ষয় ও বৃদ্ধি নাই। পঞ্চদশ কলাতে যাহা আছে তাহা সমুদয়ই এই অমা-নাম্নী কলাতে বর্ত্তমান আছে। চন্দ্রের সমস্ত সুধা এই অমা-নাম্নী কলাই ধারণ করিয়া থাকেন; উহা হইতেই পূর্ণানন্দ-সুধাধারা বিগলিত হইতেছে। অমা-কলা হইতে এই ক্ষরিত অমৃত সোমচক্র হইতে দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া এক ধারা সুষুম্নায় প্রবেশ করে এবং অন্য ধারা দিবারাত্রি ইড়ানাড়ীদ্বারা প্রবাহিত হয়। দেহ-মধ্যস্থ সূর্য্য ঊর্দ্ধরশ্মি হইয়া ইহাকে আকর্ষণ করাতে মানবের শরীরে

জরা, নানাবিধ পীড়া ও বার্দ্ধক্য প্রকাশ পায়। ইহা নিবারণের জন্যই 'বিপরীতকরণী মুদ্রা'।

এই অমা-নাম্নী কলার মধ্যে একটী কেশের সহস্রাংশের একাংশ পরিমিতা নির্ব্বাণ-নাম্নী কলা আছেন। তিনি সমস্ত ভূতের অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভগবতী ও নিত্যজ্ঞানস্বরূপা। তাহা হইতে সমস্ত প্রাণীর তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাঁহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় এবং তেজ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায়। ইহাই মহাকুণ্ডলিনী। তন্মধ্যে কেশাগ্রের কোটি অংশের একাংশ-পরিমিতা সূক্ষ্মা কোটিসূর্য্যবৎ দীপ্তি-মতী ত্রিভুবন-জননী নির্ব্বাণশক্তি বিরাজিতা আছেন। তিনি অতি গুহ্যা ও একমাত্র গুরুকৃপালব্ধ সাধকের অনুভূতিগম্যা। তিনিই সর্ব্ব-জীবের প্রাণস্বরূপা এবং সৃষ্টিকর্ত্রী। তিনি নিরন্তর প্রেমসুধা ক্ষরণ করিতেছেন। এই প্রেমসুধার কণিকামাত্র আস্বাদ করিতে পারিলে জীব ধন্য হইয়া যায়; আর দেহধারণ করিতে হয় না। এই নির্ব্বাণ-শক্তির মধ্যে যোগিগণের জ্ঞেয়, বিশুদ্ধ, নিত্য, সকল শক্তির আশ্রয়, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক, নিত্যানন্দনামক শিবপদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন কোন সুধী ব্যক্তি ইহাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। ইনিই পরমহংস। ইহাই (সহস্রার) যতি বা সন্ন্যাসীদের ধ্যেয়স্থল। যে সাধক যোগবলে ইহাকে জ্ঞাত হইতে পারেন তিনিই প্রকৃত পরমহংস পদবাচ্য হন, অন্যে নহে। কেবল মস্তকমুণ্ডন করিয়া কৌপীনধারণ করিলেই পরমহংস হওয়া যায় না।

হে পুত্র! এই সহস্রারকেই সত্যলোক বলা হয়। এই সহস্রার-পদ্ম-ধ্যানের যে কত ফল মৎসদৃশ ব্যক্তির তাহা বর্ণনা করার শক্তি নাই, তাই এই পদ্মের বর্ণনা এখানেই শেষ করিতে হইল। যখন যাহার ইহা উপলব্ধি হয়, তখন সে নিজেই ইহা বুঝিতে পারে।

হে পুত্র! একটী কথা মনে রাখিবে যে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি সহস্রারে আসিবামাত্রই সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয় না। যেমন গুরুকৃপায় কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হইলে সুষুম্না-মার্গকে পরিষ্কার করিবার জন্য নানারূপ হঠক্রিয়াদি প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা পথ পরিষ্কৃত হইলে অবাধে শক্তি সহস্রারে গমন করে তদ্রূপ কুণ্ডলিনীশক্তি সহস্রারে যাইলেও তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইবার পথগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য নানারূপ প্রাণক্রিয়াদি হইতে থাকে। এই প্রাণক্রিয়ায় কোনরূপ পূরক, রেচক ও কুম্ভকাদি নাই, কেবল অনুভূতি মাত্র—প্রাণের নানাবিধ স্পন্দন। এই সময়ে শরীরের প্রতি মোটেই মন থাকে না, কেবল নিত্য নব নব জ্ঞানের অনুভূতি হইতে থাকে মাত্র। এখানে কেবল অরূপের জ্ঞান আসিতে থাকে; তখন মূর্খও পণ্ডিত হয় এবং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইতে থাকে। এই প্রজ্ঞা তখন সকলের মধ্যে লুক্কায়িত আত্মবস্তুটীকে আর গুপ্ত থাকিতে দেয় না, তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়। এইরূপ অনুভূতিসম্পন্ন লোকের নিকট শাস্ত্রজ্ঞ হার মানিয়া যায়। মূর্খ হইলেও তখন তাহার মুখ হইতে অমিয়জ্ঞানধারা বাহির হইতে থাকে, যাহা শুনিলে শাস্ত্রজ্ঞও স্তম্ভিত হইয়া যায়।

সময়ে সময়ে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয়, যেন গুরুগম্ভীর স্বরে 'ওঁ' ধ্বনি হইতেছে; তাহা যে কত মধুর ও আনন্দপ্রদ তাহা ক্ষুদ্র লেখনীতে লিখিয়া ও ভাষায় বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। যেমন মধুমক্ষিকা পুষ্পের মধ্যে মধু আহরণের নিমিত্ত বসিবার পূর্ব্বে গুন্ গুন্ করিয়া পুষ্পের চারিদিকে ঘুরিয়া তাহার বসিবার স্থানটী নির্ণয় করতঃ তাহাতে বসে ও পরে মধুর আস্বাদে নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ যেন মহাপ্রাণস্বরূপিণী কুণ্ডলিনীশক্তি মধুর 'ওঁ' ধ্বনি করিতে করিতে

রসস্বরূপ পরমশিব বা পরমব্রহ্মে মিলিত হইয়া নিঃশব্দ হইয়া যান ইহাই ব্রহ্মভাব।

"নিঃশব্দং পরমব্রহ্ম পরমাত্মা সমীয়তে"

[নাদবিন্দূপনিষৎ]

পুনশ্চ "সশব্দশ্চাক্ষরে ক্ষীণে নিঃশব্দং পরমং পদম্"

[নাদবিন্দূপনিষৎ]

হে পুত্র! এইখানেই সাধকের নির্গুণব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি। এইরূপ স্থিতিদ্বারাই সাধক পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখের বীজকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।